

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ — বৈশাখ ১৩৫৯

তিন টাকা

প্রচ্ছদপট— অজিৎ গুপ্ত, মুদ্রণ— রণজিৎ কুমার দত্ত, নবশক্তি প্রেস, ১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪, প্রকাশক— জে. এন. সিংহ রায়, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১

শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের

করকমলে


আমার
দেখা
রাশিয়া

এক

"লৌহ-যবনিকার" ওপার থেকে যখন সোবিয়েত রাশিয়ার লেখক-সঙ্ঘের আমন্ত্রণ এলো, তখন জানতাম না এপারেও একটা 'খাদি-যবনিকা' আছে। অহিংস নিরপেক্ষতায় সমুজ্জ্বল দুগ্ধ-ধবল সাদা, কিন্তু তার ওপরও সিকিউরিটি পুলিশের ছায়ামূর্তি অস্পষ্ট ভাবে নড়াচড়া করে। চেনা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। বোম্বাই-এর দু'জন সাংবাদিক ছাড়পত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করা হ'ল। তিন জনকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করা হ'ল। ৭ই জুন (১৯৫১) বোম্বাই থেকে পাঁচ জন সাংবাদিক, লেখক কবি ও বৈজ্ঞানিক এক বিবৃতিতে বললেন, "যাঁরা বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করতে চান, তাঁদের অবারিত ভাবে সুবিধা দেওয়া হয়, কিন্তু যাঁরা সোবিয়েত রাশিয়া বা গণতান্ত্রিক চীনে বা অনুরূপ দেশে ভ্রমণ করতে চান, তাঁদের নানা ভাবে বাধা দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি, কোনো শক্তি-শিবিরে জড়িয়ে না পডা এবং নিরপেক্ষ নীতির ঘোষিত উদ্দেশ্যের এটা বিপরীত।

"আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ও সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করেও, গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে ছাড়পত্র না দেবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ জানতে পারিনি, গভর্নমেণ্টের মনোভাব দুর্বোধ্যই রয়ে গেল।

এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের একমাত্র অপরাধ আমরা মস্কৌ থেকে আমন্ত্রিত হয়েছি। এটা তাঁরা অস্বীকার করবেন, কিন্তু আমাদের ভারতের বাইরে যাওয়াটা অবাঞ্ছনীয় কেন, তার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু তাঁরা নির্দেশ করবেন না। আমরা দাবী করছি, শিষ্টাচারের খাতিরেও তাঁরা আমাদের ও জনসাধারণের নিকট একটা কৈফিয়ৎ দিন। কেন না, এর সঙ্গে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন জড়িত।"

১১ই জুন নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৈফিয়ৎটা দিলেন স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল। তিনি বললেন, ৩৯ জন নিমন্ত্রিতের মধ্যে ৩০ জনকেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বিদেশে যেতে কাউকে বাধা দেবার প্রশ্ন ওঠে না। যে-কয়জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি, তার কারণ তাঁরা রাশিয়া যেতে চাচ্ছেন বলে নয়। নিয়ম মত এ ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলিরও বক্তব্য আছে এবং তাঁরা ঐসকল ব্যক্তির "অতীত কার্যকলাপ" বিবেচনা করে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আমি ত্রিশ বৎসর বাঙ্গলা দেশে সাংবাদিকতা করছি। স্বাধীনতা লাভের পরও আমার "অতীত কার্যকলাপ" রাজ্য-সরকারের নিকট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে আছে জেনে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলাম। ছাড়পত্র না পাই, কিন্তু এই অপবাদ নিঃশব্দে পরিপাক করা কঠিন। নয়াদিল্লীর বৈদেশিক দপ্তরে কথাটা জানালাম। তারের উত্তরে জবাব এলো ছাড়পত্র মঞ্জুর হয়েছে। ১৫ই জুন বিকালে ছাড়পত্র নিয়ে সেই দিন রাত্রেই দিল্লী যাত্রা করলাম। 'খাদি-যবনিকা' উত্তোলিত হ'ল।

১৯শে জুন সকালে আমরা ১৬ জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দিল্লী বিমানঘাঁটিতে বন্ধুবান্ধবদের নিকট বিদায় নিয়ে লাহোরগামী বিমানে যাত্রা করলাম। দুপুরে লাহোর ফেলেটি হোটেলে বিশ্রাম করে বিকেলের ট্রেনে পেশোয়ার যাত্রা। আফগান-কনসাল এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এবং কাবুল-যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। জমরুদ দুর্গের সামনে পাশপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা হ'ল। আমার কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় কাবুলের সোবিয়েত দূতাবাসের এক জন রুশ কর্মচারী আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। খাইবার পাস—আঁকাবাঁকা রাস্তা, দু'ধারে রুক্ষ তরুগুল্মহীন তরঙ্গায়িত পর্বতমালা। ইংরাজ সরকার সাম্রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে চমৎকার রাস্তা করেছেন। একটি রেলপথও খাইবারের পশ্চিম প্রান্তে লাণ্ডিখানা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। আমি পূর্বে দু'বার রেলপথে লাণ্ডিখানা পর্যন্ত এসেছি। তখন এটা বৃটিশ ভারতের সীমান্ত ছিল। তোরখামে এসে মোটর থামলো, সুরু হ'ল আফগান দেশ।

লৌহদ্বার উন্মুক্ত হল। রাস্তা কদর্য, যেন কোন শুকিয়ে-যাওয়া নদীর উপল-আস্তীর্ণ বুকের উপর দিয়ে চলেছি। ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছি, উলঙ্গ পাহাড়শ্রেণী, মাঝে দুর্গ বা পাহারা দেবার ঘাঁটির ধ্বংসাবশেষ পাহাড়ের গায়ে ঝুলছে। কোথাও সবুজের রেশ দেওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। ডেকায় এসে আবার ছাড়পত্র পরীক্ষা হ'ল। যুবক অফিসারটি যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেন। তরমুজ ও খরমুজা খাওয়ালেন। মাঝখানে খরস্রোতা নদী, নদীর

দুই তীরে শস্যক্ষেত্র, সবুজ গালিচার মত বিস্তৃত। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কিছুকাল বিশ্রাম করে বেলা ৪টা আন্দাজ জেলালাবাদ ডাকবাংলোয় পৌঁছান গেল। তখন দস্তুর মত খিদে পেয়েছে। কিন্তু রমজান মাস। খাদ্য তো দূরের কথা, এক পেয়ালা চা'ও পাওয়া গেল না। সহরের খাবার দোকানও বন্ধ। দেখলাম, স্থানে স্থানে সরবতের পাত্র নিয়ে লোকে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে আছে, কামান দাগা হলেই রোজাভঙ্গ করার প্রতীক্ষায়। হতাশ হয়ে যাত্রা করা গেল। রাত্রি নয়টায় সুরাইয়া পান্থনিবাসে আসা গেল। দুপুরে ছিল অসহ্য গরম। এখন শীতল হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল। এটা জার্মানরা তৈরী করেছিল, আধুনিক আরামের সাজ-সরঞ্জামের অভাব নেই। আহার-পর্ব শেষ করে, বাইরে চত্বরে খাটিয়ার ওপর নরম বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ফুলের গন্ধ, চেনার গাছের মর্মর ধ্বনি, গিরি নির্ঝরিণীর কলস্বরের একতারা, তরল চাঁদের আলো— মনোরম পরিবেশ!

বুধবার ২০শে জুন চা-পান শেষ করে যাত্রা সুরু হ'ল। এখান থেকে কাবুল ৪০ মাইল। তরঙ্গায়িত পর্বতশ্রেণীর বুক চিরে খরস্রোতা কাবুল নদী— তার দু'পাশে চাষের জমি, ফলের বাগান। নদীর জল নিয়ন্ত্রণ বা সেচ-ব্যবস্থা এ সব কিছুই নেই। কৃষি-ব্যবস্থা সনাতন কালের, মাংসপেশী ও আদিম যন্ত্রের ওপর নির্ভর। কৃপণ প্রকৃতি দয়া করে যা দেয়, দরিদ্র কৃষকদের তাই সম্বল। শুনলাম, জল-বিদ্যুৎ কারখানা ও আধুনিক সেচ-ব্যবস্থা পত্তন করবার ভার এক মার্কিন কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা তিন বৎসর

কেবল জরিপ করছেন। যন্ত্র-শিল্প আফগানিস্থানে নেই, সামন্ততান্ত্রিক যুগের ধারা অব্যাহত। পথে দেখলাম, উট, গাধা, খচ্চরের পিঠে গৃহস্থালির জিনিসপত্র ও ছাগল ভেড়া মুরগী শিশুদের বোঝাই দিয়ে একশ্রেণীর যাযাবর চলেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা নামতে লাগলাম। সম্মুখে সমতল কাবুল উপত্যকা, শ্রীহীন জীর্ণ কুটিরে মলিন-বসন নর-নারী, ছোট ছেলেরা ভেড়া চরাচ্ছে। ক্রমে রাস্তা চওড়া হ'ল। দু'ধারে শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, গাছপালায় ঘেরা পাকা বাড়ি দেখতে দেখতে আমরা কাবুল সহরের দ্বারে এলাম। এখানে আফগান সরকার, সোবিয়েত ও ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধিরা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমরা আফগান সরকারের অতিথিরূপে কাবুল হোটেলে এসে উঠলাম।

হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে কাবুল সহর, মাঝখানে নদী। বাজার বা চাঁদনীতে আবর্জনা, বিশৃঙ্খলা আমাদের দেশের সহরের মতই, আধুনিক সহর অনেকটা পরিচ্ছন্ন। এখানেও চৌরঙ্গী আছে, আবার বস্তীও আছে। বড় রাস্তার পাশের গলিতে ঢুকলেই দারিদ্র্য, আবর্জনা, উলঙ্গ ধূলিধূসর শিশুর দল প্রাচ্যের অচলায়তনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা রাজা আমানুল্লার প্রাসাদ, ম্যুজিয়ম, সম্রাট বাবরের সমাধি প্রভৃতি দর্শন করলাম। রাত্রে হোটেলে আফগান স্বরাষ্ট্র-সচিব এক বিরাট ভোজে আমাদের আপ্যায়িত করলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত গান-বাজনা হ'ল। কাবুলী ওস্তাদ্‌দের সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় বলেই মনে হ'ল।

২২শে জুন প্রভাতে কাবুল বিমান-ঘাঁটি। সোবিয়েত বিমান

প্রস্তুত। সোবিয়েত রাশিয়ার জয়ধ্বনি দিয়ে বিমানে আরোহণ করলাম। বিমান অতি উর্ধ্বে উঠেছে— নীচে হিন্দুকুশ পর্বতমালা, কৃষ্ণকঠিন বিস্তারে বহু বিচিত্র আকার ও আয়তনের তুষার স্তূপ। দেখতে দেখতে আমরা আমুদরিয়া নদী পার হয়ে সোবিয়েত ভূমি তেরমেজে অবতরণ করলাম। তেরমেজ আফগানিস্থান ও উজবেকীস্থানের সীমান্তে একটা ছোট্ট সহর— সোবিয়েত রেলপথের শেষ সীমা। বাক্স-পেট্রা ও ছাড়পত্র পরীক্ষার পর আবার বিমান আকাশে উঠলো। অল্পক্ষণ পরেই আমরা উজবেক রিপাবলিকের রাজধানী তাসকেণ্টে এসে পৌঁছলাম। স্থানীয় লেখক-সঙ্ঘ মহিলা কবি জুলফিয়ার নেতৃত্বে অভ্যর্থনা করলেন। এখান থেকে আমাদের ভার নিলেন সোবিয়েত লেখক-সঙ্ঘের বৈদেশিক বিভাগের সহকারী সভাপতি মিকায়েল এপ্লেটিন। বয়স ৬৩ বৎসর, সুগঠিত দেহ শক্তিমান প্রৌঢ়, সদা হাস্যময়, পরিহাস-রসিক। রুশ ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না। এ ছাড়া যিনি আট সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে সর্বদা ছিলেন এবং দোভাষীর কাজ করেছেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় হ'ল। বিধবা যুবতী, মহাযুদ্ধে স্বামী নিহত হয়েছেন। একটি কন্যা আছে। কমরেড ক্রগারাস্কায়া অকসানা সিমনোভার মত বিদুষী মার্জিতরুচি দৃঢ়চেতা মহিলা জীবনে কম দেখেছি। অসঙ্কোচ সারল্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার জন হয়ে গেলেন। এঁর আদরযত্ন নিরলস সেবা সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখাবার আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমার অপটু দেহের জন্য খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকতেন, অভিভাবকের মত তিনি নিষেধ করতেন,

নির্দেশ দিতেন। আমি ওঁকে ডাকতাম 'বউমা'। বউমা কি? আমি বললাম পুত্রবধু। শুনে তো হেসে কুটিপাটি। কর্তব্যে কঠোর, কর্মে নিরলস কমরেড অকসনা, আধুনিক সোবিয়েত সমাজের একজন আদর্শ নারী।

তাসকেণ্ট সহরটি ছোট নয়, লোকসংখ্যা সাত লক্ষের ওপর। জারের আমলে এখানে শিল্প কারখানা বিশেষ কিছু ছিল না। দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদের মাটির কুঁড়ে আর যাযাবরদের তাঁবু, নোংরা বস্তী আর সরকারী কর্মচারীদের বাড়ি ও আপিস-আদালত নিয়ে ছিল মফঃস্বলের সহর। বর্তমান সহর দেখে বিস্মিত হলাম। চওড়া রাস্তা, রাস্তার মাঝখানে দু'ধারে গাছের সার দেওয়া ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটবার পথ। ট্রাম, বাস, ট্রলী-বাস চলছে। অতি আধুনিক সহরের সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। আমরা ঘুরতে ঘুরতে একটা বাগানে এলাম। বাগানে উজবেক জাতীয় কবি আলি শের নভই-এর প্রকাণ্ড মূর্তি, দক্ষিণে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড পাঁচতলা সংগীত সংস্কৃতি ভবন। আমরা বাগানে বসতেই এক পাল ছেলেমেয়ে ঘিরে দাঁড়ালো, বিদেশী দেখে কৌতূহলী হয়েছে। আমরা যখন নিজেদের দেখিয়ে বললাম 'হিন্দী', তখন ওদের মধ্যে উল্লাসের রোল পড়ে গেল। কেউ বলে রুশী, কেউ কেউ পরিচয় দেয় উজবেকী, তাতার, তুর্কী, তাজিক ব'লে। পোষাকে ও চাল-চলনে লক্ষ্য করলাম, এই সহরে মধ্য-এশিয়ার সমস্ত রিপাবলিকের লোক আছে, এবং জারের আমলের প্রবাসী রুশরাও আছে। মধ্য-এশিয়ার বস্ত্রশিল্পের প্রধান

কেন্দ্র তাসকেণ্ট থেকেই ২২শে জুন আমাদের সোবিয়েত ভ্রমণ আরম্ভ। ৪ঠা আগষ্ট আমাদের ভ্রমণের পরিসমাপ্তি তাসকেণ্টেই।

বহু ভাষাভাষী বহু জাতি-অধ্যুষিত সোবিয়েত রাশিয়া বিশাল দেশ। ছয়-সাত সপ্তাহ প্রায় অবিশ্রান্ত আমরা বিমানে, ট্রেনে, মোটরে হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করেছি, উত্তরে লেনিনগ্রাদ, মধ্যে মস্কৌ ও স্তালিনগ্রাদ, দক্ষিণ-পূর্বে সমরখন্দ, দক্ষিণ-পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের তীরে ককেশাশ পর্বতমালার কোলে স্কুমী গাগরী। জর্জিয়া ও উজবেকীস্থান এই দুইটি এশিয়ার রিপাবলিকের গ্রাম, নগর দেখেছি। মনে রাখতে হবে, ত্রিশ বছর পূর্বে জারতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের শাসন-শোষণে এখানকার কৃষক-শ্রমিকরা ছিল হতদরিদ্র, নিরক্ষর, কুসংস্কারে পঙ্গু। দশাটা আমাদের দেশের মতই। আমাদের দেশের মতই মুষ্টিমেয় ধনী, জমিদার, সরকারী চাকুরিয়া এবং স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত চূড়ার ওপর ময়ূরপাখার মত বিরাজ করতেন। রুশ দেশের এই মন্দভাগ্য জন-জীবন আমরা টলস্টয়, তুর্গেনিভ, গর্কীর লেখার মধ্যে দেখেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ পশুর স্তরে নেমে কি ভাবে নতশিরে অসীম অমর্যাদার মধ্যে জীবন যাপন করে তা তো স্বদেশে চক্ষুর সম্মুখেই প্রকট। যারা যত কঠোর পরিশ্রমী, সমাজে তাদের অবজ্ঞা ও অসম্মান তত বেশী। সকল প্রকার হীনতা স্বীকার করে শূদ্র দাসবৎ সমাজের স্নুবিধাভোগী শ্রেণীর ধন-ঐশ্বর্য আরাম-আয়াসের ব্যবস্থা করবে, ধর্মতন্ত্রে এই বিধান বহু শতাব্দী পূর্বেই পাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই দুর্বল নিরুপায়েরা যে কোন দিন জোটবদ্ধ হয়ে মানুষের অধিকার দাবী করবে, এ তো

কল্পনারও অগোচর ছিল। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় তৈরী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দুর্ভেদ্য দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিয়ে সোবিয়েত রাশিয়া সর্বমানবের সমানাধিকারের ভিত্তিতে এক নয়া সমাজ-ব্যবস্থা পত্তন করেছে, যার নিন্দা ও প্রশংসা দীর্ঘকাল শুনে এসেছি।

১৯১৭-এর মহান্ অক্টোবর বিপ্লব, লেনিন-স্তালিন চালিত বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার দুর্বার সঙ্কল্প বিশ্ব-ইতিহাসের এক বৃহৎ পটপরিবর্তন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান আক্রমণে দেশ ক্ষতবিক্ষত; বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা আক্রান্ত, প্রতিবিপ্লবীদের কৃতঘ্ন আঘাত অতিক্রম করে শিশু-সোবিয়েত নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, প্রতি পাঁচ বছরে এক এক শতাব্দী এগিয়ে যাবে, এই তার পণ। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বহু কালের দাসত্ব ও শোষণে পঙ্গু মানুষের জড়বুদ্ধি এই দুস্তর বাধা অতিক্রম করে তারা সকল রকম শোষকশ্রেণীর উচ্ছেদ করলো। গড়ে উঠলো এক ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে সর্বসাধারণের অভিপ্রায় ও উদ্যম কেন্দ্রীভূত হয়ে অসাধ্য সাধনকে সম্ভব করল। উদ্দেশ্যের ঐক্য লক্ষ্যের ঐক্য— সমাজতান্ত্রিক কলকারখানা, সমবায় কৃষিপদ্ধতি, সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের বিস্ময়কর ক্ষিপ্র অগ্রগতির মধ্য দিয়ে যখন এরা কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন আচম্বিতে হিটলারের ফাসিস্ত বাহিনীর কৃতঘ্ন আক্রমণ। মনুষ্য জাতির ইতিহাসে কোন দেশ কোন জাতি এত বড় যুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি। ভূমিকম্পের মত প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে দৃঢ়পদে দাঁড়ালেন মার্শাল স্তালিন। তাঁর

নির্দেশে লাল পল্টন অকুতোভয় শৌর্যে মানব-মুক্তির রণক্ষেত্রে ধাবিত হ'ল। তার আঘাত ও প্রতিঘাত করবার প্রচণ্ড শক্তি মহাসমরের রক্তাক্ত বহ্নিশিখায় দীপ্যমান হয়ে উঠলো। জগত বিস্ফারিত নেত্রে দেখলো সোবিয়েত রাশিয়ার কঠিনবীর্য পৌরুষ, তার রণনৈপুণ্য, তার সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর বিস্ময়কর সাফল্য। অগ্নিপরীক্ষায় বিজয়ী সোবিয়েত রাশিয়ার এই নৈতিক শক্তি আজ আবার শান্ত-সমাহিত চিত্তে গঠন ও পুনর্গঠন কাজে প্রবৃত্ত। মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সে অতলান্তিকের ওপারে ভিক্ষের জন্য হাত পাতেনি, ধনতন্ত্রী দুনিয়া তাকে একঘরে করেছে, তবু সে ক্ষোভহীন নিঃশঙ্ক। এই নূতন জগতকে চোখে দেখবার সুযোগ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। কৌতুহল ছিল, তাই শ্রদ্ধাসন্নত মন নিয়েই সোবিয়েত ভূমিতে এসেছি। এই বিশাল দেশের বন্ধনজর্জর পরস্পরবিচ্ছিন্ন বক্রমেরুদণ্ড মানুষগুলিকে এরা মাত্র ত্রিশ বছরে জ্ঞানের ক্ষেত্রে, আনন্দের ক্ষেত্রে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে কত বড় মুক্তি দিয়েছে, তার কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

দুই

অবশেষে মস্কৌ-এ আসা গেল। ২৩শে জুন শনিবার বেলা সাড়ে এগারটা। বিমান-ঘাঁটিতে সোবিয়েত লেখক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা রাশি রাশি পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা করলেন। নির্মেঘ আকাশ, উজ্জ্বল রৌদ্রালোক, আরামপ্রদ প্রশস্ত মোটরকারে চলেছি। পথের দু'ধারে বন, উপবন, বার্চ গাছের শুভ্র সমুন্নত ঋজু দেহ, চেনার ও ওকেরা মাথা তুলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারি ফাঁকে-ফাঁকে বাগান, কত রকমারি রং-এর ফুল। ত্রিশ মাইল পথের দু'ধারে কৃষিক্ষেত্রও আছে। সহরের কাছাকাছি আসতেই অনেক পুরানো ধরনের বাড়ি দেখা গেল। বামে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি তৈরী হচ্ছে, ছোট-বড় ক্রেন হেলছে-দুলছে। ক্রমে মস্কোয়া নদীর সেতু পার হয়ে ক্রেমলিন প্রাসাদ-দুর্গ ডাইনে রেখে, আমাদের গাড়ি হোটলের দরজায় থামলো। হোটেলটির নাম, "হোটেল ন্যাশনাল।" এর আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, মখমল ও রেশমের পর্দা, সুবিন্যস্ত শয়নগৃহ, পরিপাটি ভোজনাগার; বোম্বাই-এর বিখ্যাত তাজমহল হোটেলও এর তুলনায় দরিদ্র। এই পাঁচতলা হোটেলে পাঁচশ'র ওপর কামরা আছে। এই হোটেলেই আমরা বরাবর থেকেছি। সাত সপ্তাহের মধ্যে তিন সপ্তাহই আমরা মস্কৌ-এ ছিলাম। মস্কৌ-এ এমন এবং এর চেয়েও বড়

চার-পাঁচটা হোটেল আছে। শুনলাম, আরও গোটাকয়েক অতিকায় হোটেল তৈরী হচ্ছে। এরই ১২৭ নং কামরা আমার জন্য নির্দিষ্ট হ'ল। পুব দিকে জানলা, সম্মুখে সিকি মাইল চওড়া রাস্তা, তার ওধারে ক্রেমলিন; উচ্চ প্রাচীরের ওপরে জারের আমলের গীর্জার গম্বুজ, পথের দুই প্রান্তে সারিবদ্ধ চেনার গাছগুলি গ্রীষ্মকালের পত্রসম্ভারে ঘন সবুজ। ট্রাম, বাস, ট্রলি-বাস মোটর চলেছে, আর চলেছে জলস্রোতের মত জনস্রোত। ভীড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই, নেই চীৎকার ও হট্টগোল। এ কোন্ লোক থেকে কোন্ লোকে এলাম!

অপরাহ্ণে পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে আমরা রেড স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রায় দুই মাইল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ জনতা মন্থর পদে এগিয়ে যাচ্ছে লেনিনের সমাধির দিকে। আমাদের 'গাইড' গিয়ে পরিচয় দিলেন, "ইণ্ডিসকী পিশাচলী ডেলীগাৎসী—" জনতা সম্ভ্রমে বিদেশীদের জন্য পথ করে দিল। রুশ ভাষায় সাহিত্যিক লেখকদের বলে "পিশাচ"। আমাদের দেশে লেখকদের যে দশা, তাতে ও-শব্দটা বাঙ্গলা ভাষাতেই মানানসই হ'ত। যা হোক, আমরা সমাধির দ্বারদেশে পুষ্পস্তবকের শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। মর্মর-নির্মিত বেদীর ওপর ডিম্বাকৃতি কাঁচের আবরণের মধ্যে, চিরপদদলিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম ও প্রধান সেনাপতি মহামানব লেনিন চিরনিদ্রায় শায়িত, প্রশস্ত ললাটে দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠে স্বল্প শ্মশ্রু-মণ্ডিত কপোলে চিবুকে বিশ্বমানবের মুক্তির মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্কল্প। অবনত শিরে প্রণাম-নিবেদন করে নিষ্ক্রান্ত

হলাম। মানবের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয়ের আবির্ভাব। প্রত্যহ জানলা দিয়ে দেখেছি, কাতারে কাতারে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চলেছে তাদের মহান্ নেতা লেনিনকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতে। লেনিন ও স্তালিন এই দুই বিপ্লবী নেতার প্রতি লোক-সাধারণের কি অবিচল শ্রদ্ধা! এক জন সোবিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রের স্রষ্টা। অপর তাঁর উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করে পালয়িতা। দেখেছি, এই দুই নরকেশরীর প্রতিমূর্তি এবং প্রতিকৃতি রাশিয়ার সর্বত্র। ভারতেও এক দিন স্বতন্ত্র ভাবে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। তন্ত্রমন্ত্রসহায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কুহকে অধিকার-বঞ্চিত স্ত্রী-শূদ্র ভগবান বুদ্ধদেবের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে ধর্মের সমানাধিকারের নামে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, সেদিন ভগবান তথাগতের অগণিত মূর্তিতে সমস্ত এশিয়া ছেয়ে গিয়েছিল। যুগ-যুগান্ত থেকে মানুষ নর-পূজক। অহিংসা শান্তি মৈত্রী সর্বমানবের কল্যাণ এ সব আদর্শ যখন কোন মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তখনই তিনি বহু মানবের পূজা পেয়েছেন। রুশদের এই বীরপূজা হয়তো অনেকের দৃষ্টিতে আতিশয্য মনে হবে, কিন্তু আমার ভারতীয় দৃষ্টিতে এটা অস্বাভাবিক মনে হবে কেন? আমরাও রাজঘাটকে তীর্থ করেছি, সরকারী দপ্তরখানায় আপিস-আদালতে বিদ্যালয়ে বৈঠকখানায় গান্ধীজীর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেছি।

২৩শে জুন থেকে ৬ই জুলাই দু'সপ্তাহ মস্কৌ-এ কাটলো। এখানে যা দেখছি সবই আশ্চর্য লাগছে। ৭০ লক্ষ নরনারীর বাসভূমি এই বিশাল সহরে বাসগৃহের টানাটানি আছে, বসবাসের কৃচ্ছ্র তাও

আছে, কিন্তু বস্তি নেই, আমাদের দেশের মত কেউ ফুটপাথেও সংসার পাতেনি। বড় বড় নূতন রাস্তা ও সহরের উপকণ্ঠে অতিকায় প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে কর্মীদের বাসের জন্য। দশ-বারো তলা একটা বাড়ি একশ' দিনে তৈরী হচ্ছে। শুনলাম, বছর খানেকের মধ্যে গৃহ-সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শ্রমিকদের থাকবার বাড়িগুলোকে বলে 'এপার্টমেণ্ট হাউস'। এক থেকে পাঁচ কামরার ফ্লাট ; পারিবারিক প্রয়োজন মত স্টেট বা ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বণ্টন করে দেওয়া হয়। উপার্জনের তারতম্যে বাড়িভাড়া উপার্জনের শতকরা এক ভাগ থেকে চার ভাগ। বাড়ির ভাড়া বাড়িয়ে অথবা খালি বাড়ি নজর নিয়ে চড়া ভাড়ার দাঁও মারা এ দেশে বহু কাল বাতিল হয়ে গেছে। এখানে জমি ও বাড়ির (সহরে) মালিক হয় রাষ্ট্র, নয় শ্রমিক ইউনিয়ন কিম্বা ম্যুনিসিপালিটি। বিগত যুদ্ধে মস্কো এত সুরক্ষিত ছিল যে নাৎসী বিমান বোমাবর্ষণ করতে এসে বারম্বার পুচ্ছ-প্রদর্শন করে পালিয়েছে। মহাযুদ্ধের সময়ও গঠন-কাজ চলেছে পুরো দমে। এমন কয়েকটা হাসপাতাল স্কুলবাড়ি বাসগৃহ ও সংস্কৃতি-ভবন দেখলাম, যা যুদ্ধের সময় তৈরী হয়েছে। বাড়ির পর বাড়ি উঠছে, সহরের আয়তন ও পরিধি বেড়ে চলেছে, নগরীর উপকণ্ঠে দু'টো নূতন সহর পত্তন হচ্ছে। তবে এখন লোকে ঠাসাঠাসি করে বাস করে, কারো মুখে নালিশ নেই। আমার এক পুরাতন বন্ধুর বাসায় গেলাম, ইনি বুদ্ধিজীবী, সাড়ে চার হাজার রুবল মাসে মাইনে পান। সস্ত্রীক থাকেন ; সম্প্রতি একটি ছেলে হয়েছে। একখানা ঘর শোবার ও বৈঠকখানা ;

স্নানাগার ও রান্নাঘর। বিজলী ও বাড়িভাড়া দেন ত্রিশ রুবল। এক দিন এক রুশ যুবতীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। টাইপিস্ট, ইংরেজী জানে, দোভাষীর কাজও করে। বিয়ে করেছে এক জন মোটর-মিকানিককে। দু'জনের উপার্জন মাসে প্রায় দু'হাজার আটশ' রুবল। এরাও এক কামরার ফ্লাটে থাকে। আমি বললাম, এ দেশের নিয়মে বিবাহের পর তোমরা তো দু'কামরা ফ্লাট চাইলেই পেতে পার। মেয়েটি হেসে বললে, দরকার হয় না, যাদের ছেলেপুলে আছে তাদের দরকার আমাদের চেয়ে বেশী। আমি কৌতুক করে বললাম, ধর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমানের ব্যাপার ত আছে, আর একটা ঘর থাকলে গোসা করে স্বতন্ত্র হবার সুবিধা হয়। আমার কথা শুনে সলজ্জ ভাবে বললো ওটা আমরা মানিয়ে নেই। সোবিয়েত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে এই স্বার্থবুদ্ধিহীন সমাজ-চেতনা ওদের মনে জাগ্রত হয়েছে। আরো অনেক ব্যাপারে প্রমাণ পেয়েছি, সোবিয়েত তরুণ-তরুণীদের মনের চেহারা আমাদের দেশের মতই নয়। আত্মপরায়ণ অনুদারতা এদের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রায় দূর হয়েছে।

মস্কো সহরে দশ-বারটি বৃহৎ ম্যুজিয়ম আছে। এগুলিতে ঐতিহাসিক, কলাবিদ্যা, কারুশিল্প প্রাচীন ও হাল আমলের নিদর্শন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার বিভিন্ন বিভাগের ক্রমবিবর্তনের ধারা স্তরে স্তরে সাজনো হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, বাদশাহী আমলের অভিজাতদের প্রাসাদগুলিকে এরা জনশিক্ষার নিকেতনে পরিণত করেছে। মস্কো পুনর্গঠন ম্যুজিয়ম এর অন্যতম। মস্কো নগরীর

আটশ’ বছরের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস এখানে ছবি নক্সা মানচিত্র নানা মডেলে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত। সমাজতান্ত্রিক আমলে পুরাতন মস্কৌ কি ভাবে বদলাচ্ছে ও বদলাবে তার বড় বড় ইমারতের খসড়া ও নমুনা। কেবল পাদদেশে পরিচয় লেখা বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ নয়। প্রত্যেক ঘরে সব বিষয় বুঝিয়ে দেবার জন্য উপদেষ্টা আছে। দেখলাম, দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। এরা রাজধানীর সমস্ত পরিচয় জানছে বুঝছে। ভবিষ্যতের গঠনের কথা শুনছে। আমাদের ‘সবে ধন নীলমণি’ কলকাতার যাদুঘরে এমন ব্যবস্থা নেই। লোকে ভীড় করে দেখে যায়, লোক-সাধারণ বুঝলো কি না বুঝলো তা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠেছে এমন কথা শুনিনি। এখানে সোবিয়েত রাশিয়ার গর্ব ও গৌরবের ‘মস্কৌ-মেট্রো’ বা ভূগর্ভ রেল-লাইনের পরিকল্পনা দেখলাম। কতটা হয়েছে, কতটা প্রসারিত হবে, কি ভাবে কাজ এগুচ্ছে, নানা রং-এর আলোক সম্পাত করে তা আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হ’ল। বড় বড় বাড়ি কি ভাবে অক্ষত অবস্থায় ইচ্ছামত সরিয়ে নেওয়া হয়, সেই যন্ত্রের একটা মডেল দেখলাম। ইঞ্জিনিয়রিং বিদ্যায় এরা কোন দেশ থেকে পিছিয়ে নেই। এদের মস্কৌ-ভল্গা কেনাল, মরুভূমিতে খাল কেটে সেচ-ব্যবস্থা, মেট্রো বা ভূগর্ভস্থ রেলপথ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি সোবিয়েতের তরুণ ইঞ্জিনিয়রদের সৃজনীপ্রতিভার সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে।

যে প্রশস্ত রাস্তাটি ‘রেড স্কোয়ার’ থেকে বেরিয়ে ‘হোটেল ন্যাশনালের’ গা ঘেঁষে পশ্চিমমুখো চলে গেছে, তার নাম গর্কী

স্ট্রীট। সহর-কর্তারা স্থির করলেন, রাস্তাটাকে চওড়া করতে হবে, অতএব এক পাশের বাড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলা যাক। আপত্তি উঠলো, ওতে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি-মণ্ডিত ভবন লুপ্ত হবে। অতএব ইঞ্জিনিয়রদের পরামর্শে বাড়িগুলো সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হ'ল। শুনলাম, দশ-বারতলা অতিকায় ইমারতগুলি, বিজলী টেলিফোন ও জলের পাইপের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করে, যন্ত্রযোগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ মাত্র তু'বৎসর পূর্বের কথা। এই গর্কী স্ট্রীট দিয়ে বহু বার যাতায়াত করেছি, দেখেছি তু'ধারে ১০।১২ হাত উঁচু চেনার গাছের সার। তু'বছরে গাছগুলি এত বড় হ'ল কি করে? জবাব পেলাম, সমান মাপের এই গাছগুলিকে বন থেকে তুলে এনে লাগান হয়েছে। এখানে বাগান ও গাছ-পালার কত যত্ন! পথের ধারের গাছের গোড়ায় বৃত্তাকার লৌহবেষ্টনী, যাতে গাছের শিকড়ে পথিকের পায়ের চাপ না লাগে।

মস্কোর রাস্তায় দিবারাত্র লোক চলাচল করছে। সকলেরই ফিটফাট পোষাক, দৈন্যের মালিন্য নেই। দেখলেই বোঝা যায়, এরা সব কাজের লোক। অথচ জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর তাগিদে এরা উন্মত্তের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে না। ,মেয়েদের পোষাকে রুচিবোধ আছে, কিন্তু বিলাসিতার পালিশ নেই। ঠোঁটে-মুখে রং দেওয়া, আঁকা ভ্রূ, অতি-প্রকট প্রসাধন কদাচিৎ চোখে পড়েছে। রূপের কৃত্রিম জৌলুষ রুশ-যুবতীরা পছন্দ করে না, তারা স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক লাবণ্যের শ্রী-মণ্ডিত। এরা প্রগলভা

নয়। রাস্তায় পুরুষের সঙ্গে কোমর জড়াজড়ি করে এরা চলে না। সোহাগে গলে পুরুষের বাহু নির্ভর করে এরা মরালগামিনী নয়। পশ্চিম-ইয়োরোপের মত পথে-ঘাটে-উদ্যানে প্রকাশ্য ভাবে চুম্বন আলিঙ্গন এরা কল্পনাও করতে পারে না। এক দিন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ সোবিয়েত নারীদের খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'শিক্ষাবিধি এদের চরিত্র বদলে দিয়েছে। এদের চরিত্রে কঠোরতা আছে, রুক্ষতা নেই। এরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে, জাতীয় কর্মশালার সকল বিভাগেই এরা কাজ করে। এ দেশ থেকে বিলাসিনীর দল অন্তর্ধান করেছে। বৃহৎ যন্ত্র এরা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাচ্ছে, বিপণি, কারখানা, হাসপাতাল, বিদ্যালয় এরা কর্ত্রী হয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে। এরা অবলাও নয়, দুর্বলাও নয়, অথচ স্নেহ-মমতায় ভরা নারী।'

কয়েক দিন ক্রমাগত ৮।১০ ঘণ্টা হেঁটে ম্যুজিয়ম কারখানা নানা প্রতিষ্ঠান দেখার শ্রম দেহে সইল না ; একদিন শেষ রাত্রে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। সকালে লেডী ডাক্তার এসে ওষুধের ব্যবস্থা করলেন, দুপুরে আর এক জন এলেন, নাক কান গলা পরীক্ষা করে দেখলেন। হোটেলের বুড়ি ঝি ওষুধ খাওয়ায়, মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ভেবো না আমরা আছি। হেসে বলি, আমার দেশে এর চেয়ে বেশী যত্ন হ'ত না। শুনলাম, এখানে শতকরা চল্লিশ জনই নারী ডাক্তার। সেদিন আমার শয্যার পাশে এলেন এক জন মহিলা, আমার নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য। নাম কমরেড রুবী। ইংরেজী ও জর্মন ভাষা জানেন। বহু বর্ষ চীনে

কাটিয়েছেন। চীনের কমিউনিস্টদের অনেক গল্প বললেন। ভারতেরও অনেক খবর রাখেন। চীনে জনগণের দারিদ্র্য, রক্ষণশীলতা আর চিরাগত অভ্যাসের মূঢ়তা কেমন ভাবে বদলাচ্ছে, সেই কথা বলতে বলতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা তো আত্মকর্তৃত্ব পেয়েছ, তোমরা পারছো না কেন? আমাদের কি দারিদ্র্য ও দুঃখ ছিল, তা আমি নিজেই ভোগ করেছি। এখন যা দেখছো, এ তো আমাদেরও স্বপ্নের অগোচর ছিল।' আমরা যে কেন পারি নে, সে অক্ষমতা আমাদের স্বভাবের মধ্যে পাকা আসন পেতেছে। জড়প্রথার দাসত্ব করতে করতে আমরা দৈব ও পরের ইচ্ছায় চালিত হই। এটা এই বিদেশিনীকে কেমন করে বোঝাই। দেড়শ' বছরের ইংরেজ শাসন আমাদের সর্বরিক্ত দারিদ্র্যের মধ্যে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-অবিশ্বাসের মধ্যে পঙ্গু করে ফেলে রেখে গেছে। ইংরেজের পরিত্যক্ত ব্যবস্থা আমরা বদলাতে পারিনি, সে সাহসও পাই নে। আত্মকর্তৃত্ব লাভ আমাদের ভাগ্যে ফাঁকিই রয়ে গেল। মুখে বলি, 'বিপ্লবের পর লেনিন-স্তালিনের পার্টির নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তোমরা প্রাচীন বাঁধনগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছ বলেই তোমাদের সমাজের সর্বস্তরে এমন মুক্তির হাওয়া বইছে।' রুবী সচকিত হয়ে বললেন, 'সর্বস্তর বলতে তুমি কি বোঝ? আমাদের সমাজে শ্রেণী নেই। শ্রেণীভেদ আমরা লুপ্ত করেছি। আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। ফলে সমাজের জ্ঞান বিদ্যা ঐশ্বর্য, একটা অংশে সঞ্চিত না হয়ে তা সকলের সম্পদ হয়েছে। মানুষের মধ্যে জাতিগত বা

কুলগত বিশেষ গুণ বংশগত হয়ে সঞ্চারিত হয়, এ থিয়োরী যে মিথ্যা আমাদের সমাজের দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে।'

'সকল মানুষকে সমান অধিকার দেবার নামে, তোমরা বিশেষ মাপের মানুষ তৈরী করার জবরদস্তি চালাও, দেশে থাকতে এমন অভিযোগ শুনেছি।'

রুবী হেসে বললেন, 'ধনতন্ত্রী দেশের বুর্জোয়ারা দীর্ঘকাল এই অপবাদটা রটাচ্ছে। সোস্যালিজম এদের দৃষ্টিতে ব্যক্তির বিকাশকে দাবিয়ে দেওয়া, ব্যক্তিগত চেষ্টাকে নিরুৎসাহ করা, প্রত্যেককে কলে তৈরী পণ্যের মত সমান মাপে তৈরী করা। এই যদি হ'ত, তা' হলে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে, সোবিয়েতের যুবক-যুবতীরা এত সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বকীয় শক্তির প্রেরণায় কাজ করার উৎসাহ পেল কোথা থেকে? তুমি চোখ খুলে যদি আমাদের দেশটা দেখ, তা'হলে দেখবে, সোবিয়েত যুবশক্তি কমিউনিস্ট-সমাজ গঠন করবার জন্য এগিয়ে আসছে,— আবিষ্কারক শিক্ষক কারুশিল্পী ইঞ্জিনিয়র স্থপতি বৈজ্ঞানিক শিল্পী অভিনেতা সঙ্গীতজ্ঞ। এরা কি কলে-ছাঁটা এক মাপের মানুষ?'

রুবীর সঙ্গে সেদিনের আলোচনার পর আমার দেখে-শুনে মনে হয়েছে, কশাকের কশাঘাতে অপহৃত পৌরুষ, ধর্মমোহে আবিষ্ট, প্রথার অনুবর্তনে পঙ্গু মানুষকে সচল করবার জন্য প্রথম দিকে হয়তো বলশেভিকদের জবরদস্তি ছিল, ধনিক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার কঠোরতাও ছিল। বহু দিনের পতিত জমিতে ফসল ফলাতে হলে প্রথমে আগাছা মারতে হয়। বলশেভিকরা তীক্ষ্ণ

লাঙ্গল চালিয়ে এক দিন পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছিল। সেই অবস্থা এখনো চলছে, এ কথা বললে এদের ওপর অবিচার করা হবে। শাসননীতির জবরদস্তি চলে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ অবুদ্ধির অন্ধকারে থেকে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণীর দাসত্বকেই বিধিলিপি বলে মেনে নেয়। কিন্তু যারা শিক্ষা-প্রচারকে এমন প্রবল করে তুলেছে, যুক্তিপন্থী আধুনিক যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডার সর্বসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত করেছে, সেখানে জবরদস্তিকে সংযত হতেই হয়।

এ দেশে পুলিশী রাষ্ট্রের বিভীষিকা, গুপ্ত গোয়েন্দা পুলিশের নিঃশব্দ পীড়নের কাহিনী অনেক শুনেছি। দেশসুদ্ধ লোককে সর্বদা ভয়ার্ত করে রাখার পাকাপাকি ব্যবস্থা। কিন্তু মুস্কিল এই, এ জিনিষটা চোখে দেখা যায় না। আমাদের বাঙ্গলা দেশে শৈশব কাল থেকেই পুলিশী-পীড়নের ব্যবস্থা দেখেছি। পুলিশের বিষাক্ত দংশনে কত তরুণ জীবন মুকুলে ঝরে গেছে। রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড এক দিন নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছে এই সন্দেহে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে কত যুবক বিনা বিচারে আটক হয়েছে, দ্বীপান্তরে বছরের পর বছর আকাশের নক্ষত্র গোনে কাটিয়েছে। ইংরাজরাজের সেই পুলিশী ব্যবস্থা আজও অব্যাহত আছে। বিশেষ রাজনৈতিক মত পোষণের অপরাধে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে সরকারী চাকুরী পায়নি বা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে, স্বাধীন ভারতেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের

হাতবদল হলেও শাসকশ্রেণী পুলিশী দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করেনি। এই তো সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে পুলিশী নিষ্ঠুরতার একখানি ছায়াচিত্র কর্তৃপক্ষ দীর্ঘকাল মঞ্জুর করেননি। তাঁদের যুক্তি, এতে পুলিশের প্রতি জনচিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হবে। ইংরাজ আমলের পুলিশের আচরণ সম্পর্কেও সেন্সারী সতর্কতা আমরা দেখি। নাটকাভিনয় সম্বন্ধেও এমনি সতর্কতা আছে। পক্ষান্তরে, সোবিয়েত রাশিয়ায় এমন অনেক চলচ্চিত্র দেখেছি, যাতে জারের আমলের পুলিশের বীভৎস নিষ্ঠুরতা উলঙ্গ করে দেখান হয়েছে। একদিন মস্কৌ-এর এক সার্কাসে দু'জন পুলিশ কনেস্টবলকে কয়েকটি ছেলে কি ভাবে নাকাল ও নাস্তানাবুদ করলে, তার ব্যঙ্গাভিনয়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হ'ল, এও দেখলাম। ম্যুজিয়মেও পুলিশী অত্যাচারের ছবি দেখেছি, বিপ্লবীদের প্রতি জারীয় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার কেবল ছবির পর্দায় নয়, রঙ্গমঞ্চের অভিনয়েও দেখেছি। নিষ্ঠুর পুলিশী শাসনের ধারা যদি তেমনিই থাকতো, তবে তার প্রতি জনচিত্তে ঘৃণার উদ্রেক করাটা আর যাই হোক, সোবিয়েত গভর্নমেন্টের দূরদর্শিতার পরিচয় নয়। আমাদের ইংরাজ শাসকেরা তো নয়ই, দেশী শাসকেরাও এমন ভুল করেন না।

তিন

প্রতিদিন ম্যুজিয়ম, লাইব্রেরী, পাঠাগার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখছি, মোটরে সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাচ্ছি। সকাল ১০টার পর থেকে পরিদর্শন সুরু হয়, সান্ধ্য ভোজনের পর অভিনয়, গীতি-নাট্য, ব্যালে নৃত্য দেখবার জন্য যাই, রাত্রি ১২টার পর নৈশ-ভোজন ও শয়ন। ১লা জুলাই থেকে নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যাবে। নাটুকে দল, নট-নটীরা কেউ গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করতে যাবেন অথবা নানা প্রান্তের নাট্যশালায় অভিনয় করতে যাবেন। আমরা বলশই থিয়েটার, মস্কো আর্ট থিয়েটার, মালী থিয়েটার, চেকোভস্কী ম্যুজিক হল প্রভৃতি নাট্যশালায় নৃত্য-গীত-অভিনয় দেখেছি। এক মস্কো সহরেই ২৫।৩০টি নাট্যশালা আছে। বিপুল এগুলির আয়তন, ৪।৫ তলায় অর্ধবলয়াকৃতি বসবার সুখদ আসন, দেয়ালে স্বর্ণরঞ্জিত কারুকার্য, মহার্ঘ আস্তরণ। এ সমস্তই জাতীয় সম্পদ। পুরাকালে যা অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের বিলাস ও ব্যসন ছিল, তার দ্বার আজ কৃষক ও শ্রমিক-শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত। অভিনয় সঙ্গীত বিশেষত ব্যালে নৃত্য ও অপেরায় এরা সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার রসবোধ আদৌ নেই, ও নিয়ে অনধিকার চর্চা করবো না। ভাষা না জানার দরুণ অভিনয়ের অনেকখানি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। উক্রেন

লোক-নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। একদিন সন্ধ্যায় বলশই থিয়েটারে এক স্বপ্নরাজ্য চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হ'ল। বিখ্যাত নর্তকী চিখামিরনোভা তাঁর দলবল নিয়ে 'সোয়ান লেক' অপেরা-পালা অভিনয় করলেন।

আমি তরুণ বয়সে কলকাতায় আনা পাবলোভার রাজহংস নৃত্য দেখেছি। নৃত্যশাস্ত্রে আমার এমন কোন জ্ঞান নেই যে, তুলনামূলক বিচার করবো। পঞ্চাশটি রূপসী নর্তকীর মধ্যে চিখামিরনোভার অপূর্ব সাবলীল দেহের বিচিত্র ভঙ্গিমা, লীলাচঞ্চল পদদ্বয়ের লঘু গতি, তিন হাজার দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। নৃত্যের অনায়াস নৈপুণ্যে তিনি প্রণয়বেদনা-বিহ্বল একটা ভাবলোকের সৃষ্টি করলেন, যার মাধুর্য রসে অভিভূত হয়ে গেলাম। মূর্খ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ধনীর মন-ভোলানো নটীর চপল নৃত্য নয়, মানুষের নীচ প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করবার জন্য বিশেষ অঙ্গের স্থূল সঞ্চালন নয়, এ দেহাতীত আনন্দময় সত্তার প্রকাশ। এই অভিনয়ের রাতে বৃটেনের 'রেড-ডীন' ডাঃ হিউলেট জনসন উপস্থিত ছিলেন। তিনি যবনিকা পড়লে, আমাদের 'বক্সে' এসে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। পক্ক-কেশ, সৌম্য মূর্তি দেখলেই শ্রদ্ধায় অবনত হতে হয়।

রুশ-দর্শকেরা আনন্দ প্রকাশ করবার বা নট-নটীদের অভিনন্দিত করবার জন্য বারম্বার দীর্ঘস্থায়ী করতালি দিয়ে থাকে। যবনিকা পড়া মাত্র হাততালি গ্রামে গ্রামে উঠতে থাকে। যাঁর বা যাঁদের উদ্দেশ্যে এই করতালি, তাঁরা পর্দা সরিয়ে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত

হন। তাঁরা অন্তরালে গেলে আবার দ্বিগুণ জোরে হাততালি পড়তে থাকে। এই ভাবে অন্তত তিন-চার বার নট-নটীদের গুণমুগ্ধ ভক্তদের দর্শন দিতে হয়। যবনিকা পড়া মাত্র আমি তো কানে আঙ্গুল দিতাম, পার্শ্ববর্তীরা অবাক হয়ে তাকাত। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই বিরামহীন করতালির মাধুর্য আমি কিছুতেই উপভোগ করতে পারতাম না। এটা আতিশয্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এ দেশে শিল্পী লেখক কবির প্রতি লোক-সাধারণের যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখেছি, তা আমাদের দেশের শতকরা আশী জন অশিক্ষিত এবং শিক্ষিতম্মন্য কুশিক্ষিতদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না।

এদের অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্যকলার উৎকর্ষ সাধনের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সাহায্য। জাতীয় নাট্যশালা আমাদের দেশে এখনও কল্পনার ব্যাপার। কলকাতা সহরে এক কালে বেসরকারী নাট্যশালার সমাদর ছিল। কিন্তু সিনেমার খেলো চটকদার ছবি তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। অন্যত্র দূরস্থান, রাজধানী নয়াদিল্লীতেও একটা নাট্যশালা নেই। রাশিয়ায় দেখলাম, সিনেমায় বা নাট্যশালায় যৌন আবেদনপূর্ণ অভিনয় নেই, প্রায়-উলঙ্গ নারী-দেহের অংশ-বিশেষকে অনতি-উদ্ঘাটিত করে লোভীদের উদ্‌ভ্রান্ত করা ওখানে অচল। কেন না এরা এগুলোকে লোকশিক্ষার বাহন বলেই মনে করে। লোকের রুচিবোধ নেমে না যায়, সেদিকে এদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। আর আমাদের দেশে হলিউডের নকলে চলচ্চিত্র-শিল্পের দিনে-দিনে যে কত অধঃপতন হচ্ছে, তা নিয়ে

বিলাপ করাও নিষ্ফল। আমি রাষ্ট্রের সাহায্যের কথা বলেছি, কিন্তু এখানে সিনেমা নাটকের ওপর রাষ্ট্র বা কমিউনিস্ট পার্টির দরদ আছে, খবরদারী নেই। চলচ্চিত্র এবং অভিনয়ের গল্প ও নাটক নির্বাচন করেন লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ। এঁদের ইউনিয়ন থেকেই এগুলো সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, লোকে পয়সা দিয়ে দেখে এবং যে আয় হয়, তা থেকে শিল্পীরা মজুরী পান এবং তৈরী ও পরিচালনার খরচাও উঠে আসে।

মস্কৌ-এর সরকারী শিশুসাহিত্য প্রকাশভবন। কিন্তু শিশুসাহিত্য বললে ভুল হবে। পাঁচ থেকে সতের বছরের স্কুলের ছেলেদের জন্য ছবি গল্প উপন্যাস ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগীয় বই সুনির্বাচিত হয়ে এখান থেকে প্রকাশিত হয়। নির্বাচন করেন শিশুসাহিত্যিক-সঙ্ঘ। কেবল রুশ ভাষা রমৌলিক রচনা নয়, পৃথিবীর সব ভাষার ভাল বই অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত ভাষার কথাসরিৎসাগর, দশকুমারচরিত ও বিষ্ণুশর্মার উপাখ্যানের অনুবাদ দেখলাম, অবশ্য ভারতীয় চলতি ভাষা থেকে অনুবাদ খুবই কম হয়েছে। ফরাসী, জর্মন ও ইংরেজীই বেশী। প্রবেশ-পথের পরই পাশাপাশি দুটো পাঠাগার। একটায় ৫।৬ বছররের ছেলেরা নানা রঙ্গীন ছবির বই দেখছে, আর একটায় ১৪।১৫ বছরের ছেলে-মেয়েরা পড়ছে। দেয়ালে সাহিত্যিকদের ছবি— দু'পাশের তাকে থরে-থরে বই সাজান। পড়ুয়াদের সাহায্য করার জন্য পরিদর্শিকারা রয়েছেন। এখানে কর্ত্রী থেকে সকলেই নারী। পরিপাটি পড়বার ও বসবার জায়গা।

পড়ুয়ারা আমাদের দেখে সচকিত হয়ে উঠলো। আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটি ১৪ বছরের মেয়ে ভিক্তর হুগোর "নাইনটি থ্রি" পড়ছে, আর একটি মেয়ে পড়ছে, বিশ্ব ইতিহাস। সে ভারতের অংশটা বার করে দেখালো, সম্প্রতি ভারত যে ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়েছে সে খবরও রাখে। এদের সঙ্গে আমরা আলাপ জমিয়ে নিলাম। এ একজন মোটর-চালকের মেয়ে, জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের দেশে কিশোর-আন্দোলন, কিশোর-সঙ্ঘ আছে? উত্তর দিলাম ; ছাড়া ছাড়া ভাবে সঙ্ঘ-সমিতি আছে বৈকি? তারা কি করে? বিজ্ঞান-ইতিহাস আলোচনা করে কি না, দেশের পরিচয় লাভের জন্য দল বেঁধে ভ্রমণে যায় কি না? উত্তর দিলাম, এ-রকম সুবিধা আমাদের দেশে খুব কম ছেলে-মেয়েই পেয়ে থাকে। একটি ছোট মেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, কোরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার মত কি? আমি বললাম, আমাদের দেশের লোক যুদ্ধকে ঘৃণা করে। আমেরিকার এই জুলুমে আমাদের সহানুভূতি কোরিয়ানদের দিকে। সে উৎসাহিত হয়ে বললে ; তোমাদের দেশে শান্তি-আন্দোলন আছে? নিশ্চয়ই আছে। আমার কথা শুনে মেয়েটি দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। এক মুঠো চীনে মাটির ছোট্ট ঘুঘু এনে আমাদের জামায় পরিয়ে দিল। আগ্রহ ভরে বললো, তোমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের আমাদের অভিনন্দন জানিয়ো, বলো, আমরাও যুদ্ধবিরোধী শান্তি-আন্দোলন করছি।

এখানে নানা বিভাগ। একটা বড় হল দেখলাম, মাসে দু'বার নামজাদা শিশু-সাহিত্যিকেরা এসে এখানে বক্তৃতা করেন,

দেশ-বিদেশের শিশুশিক্ষার কথা শোনান। অগ্রসর হয়ে দেখি, একটি কক্ষে ১৫।২০টি যুবতী মেয়ে শিশু-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছে। এরা গ্রাজুয়েট, গবেষণামুলক প্রবন্ধ লিখে ডিপ্লোমা পেলে, হয় শিক্ষয়িত্রী নয় লাইব্রেরিয়ান হবে। শিক্ষা স্বাস্থ্য শিশুপালন সমাজসেবা ব্যাপারে এখানে নারীদেরই প্রাধান্য। শিশুদের সব রকম যত্ন নিয়ে মানুষ করে তোলা এরা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। ছোটদের সব রকম প্রতিষ্ঠানে কমরেড স্তালিনের বাণী লেখা দেখেছি, শিশুদের অকল্যাণে রাষ্ট্রের অকল্যাণ। একটি শিশুকেও যেন অবহেলা না করা হয়। ছোটদের মানসিক উন্নতির জন্য এখান থেকে বৎসরে ৫০ লক্ষ বই সোবিয়েতের নানা কেন্দ্রে পাঠান হয়, এদের ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী আছে। আমরা অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করলাম, কোন্ শ্রেণীর বই-এর চাহিদা বেশী। তিনি বললেন, গল্প ও জীবজন্তুর কথা ও ভ্রমণকাহিনীর পরেই ছোটরা বিজ্ঞান-ইতিহাসের বই বেশী পছন্দ করে। ডিটেক্‌টিভ বা খুন-চুরি-ডাকাতি নিয়ে লেখা বই আমরা ছোটদের হাতে দেই না।

আমরা যখন মস্কো-এ তখন স্কুল-কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি। এ সময় সহরের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। চলে যায় গ্রামে, স্বাস্থ্যনিবাসে। সাইবেরিয়া, ককেশাস, কৃষ্ণসাগরের তীর, সর্বত্র ছোটদের পাইওনীয়র ক্যাম্প ও সেনাটোরিয়াম আছে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা আসে সহরে। গ্রামের ও সহরের খালি স্কুল-কলেজের বাড়িগুলোতে এরা খাবার-থাকবার ব্যবস্থা করে নেয়। এই ভাবে এদের শিক্ষা তো চলেই, বিশাল দেশের

সঙ্গে পরিচয়ও নিবিড় হয়ে ওঠে। এর জন্য সরকার থেকে এবং বিভিন্ন শ্রমিক-সঙ্ঘ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। কৃষ্ণসাগরের তীরে সুকুমীতে দেখেছি, বেলো-রুশ, উক্রেনের ছেলে-মেয়েরা এসেছে, মহানন্দে সমুদ্র-স্নান করছে। আবার লেনিনগ্রাদের "পাইওনীয়র্স প্যালেস" বা কিশোর প্রাসাদে দেখেছি, দূর-দূরান্তর থেকে ছেলে-মেয়েরা এসেছে। এটি জারের আমলের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল। ২০০ কারুকার্যময় কক্ষ। এখন ৯ থেকে ১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হয়েছে। আমরা যখন গেলাম, তখন দেখি বাজনার তালে তালে বাগানে প্রায় দু'শো ছেলে-মেয়ে গান গেয়ে নাচছে। বাগানের গাছতলায় ছেলে-মেয়েরা জটলা করে নানা রকম খেলায় মেতেছে। এই প্রাসাদে সিনেমা, থিয়েটার, পুতুলের থিয়েটার, লাইব্রেরী, পদার্থবিত্থা, রসায়ন, প্রাণীবিত্থার বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। জারের আমলে যে সব সুরম্য কক্ষে কার্পেটের ওপর অভিজাত সুন্দরীরা নৃত্যে-লাস্যে বিভোল হতেন, সেখানে কৃষক-শ্রমিকের ছেলে-মেয়েরা নানা রকম শিক্ষা লাভ করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা-কক্ষটি দেখে চমৎকৃত হলাম। আলো নিবে যাওয়া মাত্র দেখি, উপরে আকাশে সূর্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহগুলি অগণিত তারকামণ্ডলীর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, দূরত্ব প্রভৃতি এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এটাকে ছোটদের একটা বিশ্ববিত্থালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। এমনি সব শিক্ষায়তন এরা দেশের সর্বত্র গড়ে তুলেছে। ভাবীকালের সুস্থ-সবল মানুষ গড়বার জন্য।

২৫শে জুন সোমবার। সোমবার এখানে ছুটির দিন। জানলা দিয়ে দেখছি, মেয়েরা থলেয় রুটি-তরকারী, মাছ-মাংস নিয়ে চলেছে। সোমবার অন্য সব দোকান বন্ধ হলেও খাবারের দোকানগুলো খোলা থাকে। কাজেই অত্যধিক ভীড়। একটা দোকানে ঢুকে দেখি, চিনি কিনবার জন্য বিরাট কিউ। যেখানে রেশনকার্ড নেই, বাঁধাবরাদ্দ নেই, সেখানে এত ভীড় কেন ? জানতে পারলাম, এখন স্ট্রবেরীর মরশুম। মেয়েরা সারা বছরের জন্য জ্যামজেলী তৈরী করে রাখবে, তাই চিনির চাহিদা বেড়ে গেছে। শুনেছিলাম, এ দেশে গেরস্থালী বলে কিছু নেই। সকলেই সরকারী লঙ্গরখানায় পাইকারী ভাবে তৈরী খাবার খায়, ব্যক্তিগত রুচির বালাই নেই। কিন্তু দেখলাম, এখানে মেয়েরা কারখানায় হাসপাতালে স্কুলে আপিসে কাজে করে বটে, তেমনি আবার স্বামী ছেলেপেলে নিয়ে ঘরকন্নাও করে। বাজার মেয়েরাই বেশীর ভাগ করে। কয়েকটা দোকান ঘুরে দেখলাম, তরি-তরকারী আমাদের দেশের মতই। আলু পেঁয়াজ ফুলকপি বাঁধাকপি টমাটো শাক মটরশুটি মায় আমাদের লাউ কুমড়ো বেগুন পর্যন্ত। এ ছাড়া শশা আঙ্গুর আপেল পীয়ার স্ট্রবেরী প্রভৃতি ফল। অবশ্য ফলের অজস্রতা দেখেছি জর্জিয়ায়, উজবেকীস্থানে। মস্কৌ-এ বেশীর ভাগ ফল বাইরে থেকে আমদানী করা। দোকানে এদের জিনিষপত্র কেনা দেখে লোক-সাধারণের স্বচ্ছলতার আঁচ পাওয়া যায়। যাকে বলে একেবারে নিঃস্ব, এ দেশে তারা লোপ পেয়েছে।

মস্কৌ এবং অন্যান্য সহরের সর্বত্র দেখেছি, ঠেলা-গাড়ির ওপর

রাস্তার ফুটপাতে সরবত ও আইসক্রীমের দোকান। ছেলে-বুড়ো সকলেই রাস্তায় আইসক্রীম বা "মারোজনা" চিবুতে চিবুতে যাচ্ছে। দাম কম নয়, ৭৫ কোপেক থেকে দেড় রুবল। এ কথাটা মনে পড়লো একটা বিশেষ কারণে। রাশিয়া থেকে ফিরবার পথে কয়েক দিন রোমে ছিলাম। এখানে আমেরিকানরা ইংরেজীতে দৈনিক "রোম আমেরিকান" নামে একখানা কাগজ বার করে। এক দিন দেখি, ঐ কাগজে লিখেছে, বার্লিন যুব-উৎসবে যোগদানকারী দেড় হাজার রুশ যুবক-যুবতী পুলিশ-কর্ডন ভেঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন এলাকায় প্রবেশ করে। ওরা পেটুকের মত আইসক্রীম খেতে লাগলো। এ জিনিষ ওরা জীবনে কখনও খায়নি। রাশিয়ানদের সম্বন্ধে এমন আজগুবী গল্প বললে, বিশ্বাস করার লোকের অভাব হয় না! খাবার ওদেশে প্রচুর ও সস্তা। ওদেশে ভেজিটেবল ঘি বা মার্গারিন নেই। কৃত্রিম স্নেহ-পদার্থ ওদেশে আইনতঃ নিষিদ্ধ।

দলবদ্ধ হয়ে দোভাষী সঙ্গে নিয়ে লাইব্রেরী, ম্যুজিয়ম, কারখানা প্রভৃতি দেখার সুবিধে আছে, এ ছাড়া অল্প সময়ে অনেক জিনিষ দেখাই কঠিন। মোটরে পথের দু'ধারে যা দেখি, তার পরিচয় রুশ-সঙ্গী না থাকলে অজ্ঞাতই থেকে যায়, তবুও মাঝে মাঝে আমি মস্কোর রাস্তায় একা বেড়িয়ে পড়তাম। আমাদের ভ্রমণ-তালিকা সুরু হত ১০টায় প্রাতরাশের পর। প্রভাতে অনেকটা সময় পেতাম। সুযোগ পেলেই ৩।৪ মাইল চক্কর দিয়ে আসতাম। দোকান-পশার আর জনতা দেখতাম, কথা বলার কোন সুবিধাই

হ'ত না। কিন্তু চোখে দেখার শিক্ষাও কম নয়। দেখতাম, ঝাড়ুদারণী হাতওয়ালা লম্বা ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা সাফ করছে, পায়ে জুতো, সিল্কের মোজা, রঙ্গীন ছিটের পোষাক, হাতে হাতঘড়ি, হাঁটু পর্যন্ত একটা সাদা কাপড়ের আবরণী। মাথায় রুমাল দিয়ে চুল বাঁধা। নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে বিরক্তির চিহ্ন নেই। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠতো কলকাতার মেথরাণীরা, রূপ ও সজ্জার বর্ণনার প্রয়োজন নেই। নীল রঙের কোট, পাতলুন পরা পোর্টার ঠেলাগাড়িতে দুধ বা দৈ-এর বোতল, বরফ নিয়ে চলেছে, আমাদের দেশের মতো শতছিন্ন মলিন কটিবাস পরা নয়। একটি লোকও কোন দিন রাস্তায় ভিক্ষের জন্য হাত পাতেনি। বড় রাস্তার পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকেও দেখেছি, উলঙ্গদেহ ধূলি-ধূসরিত অপুষ্ট দেহ ছেলে-মেয়ে নেই। মস্কৌ-এর নাগরিকেরা সকলেই ধনী, স্বচ্ছল এমন কথা বলিনে, কিন্তু আমাদের দেশে হতদরিদ্র, পরের উচ্ছিষ্ট-ভোজী, পশুর মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়া মানুষের সঙ্গে তুলনায়, এরা জীবন যাপনের অসম্মান ও হীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

রোমের রাস্তায় ধুতিপাঞ্জাবী পরে বেরিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম, ছেলের দঙ্গলের টিট্‌কারীর চোটে পালিয়ে এসে হোটেলে ফিরিঙ্গী সেজে বাঁচি। কিন্তু মস্কৌ, স্তালিনগ্রাদ, তাসকেণ্টে আমার বাঙ্গালী পোষাক দেখে, ছেলে-বুড়ো সকলেই বিদেশী বলে সম্ভ্রম দেখিয়েছে। বহু জাতির বাস সোবিয়েতে জাতি, বর্ণবিদ্বেষ একেবারেই লুপ্ত হয়েছে। এর কারণ, সোবিয়েত

গভর্নমেণ্ট সর্বসাধারণের দেশভ্রমণের দরাজ ব্যবস্থা করেছেন। ইয়োরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সুবৃহৎ এদের দেশ, বহু ভাষাভাষী বিচিত্র জাতীয় মানুষ এর অধিবাসী। আমাদের বিশাল ভারতে কিছু তীর্থযাত্রী ও সৌখিন ভ্রমণকারী ছাড়া কে দেখেছে বিচিত্র মানবমণ্ডলীকে! আমাদের এবং অন্যান্য দেশে যেমন ভ্রমণ সখের ও ব্যয়সাপেক্ষ, যা ধনীলোকের পক্ষেই সম্ভব, সোবিয়েতে ঠিক তার উল্টো। কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী নরনারীরা দল বেঁধে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সরকারী খরচে ও ব্যবস্থায় ভ্রমণ করছে, এ ও-দেশের সাধারণ নিয়ম। বিভিন্ন রিপাবলিকে ভ্রমণের উৎসাহ দেওয়া, তার সুবিধে করে দেওয়ার ফলে অপরিচয়ের সঙ্কোচ গেছে ঘুচে। তাই এরা ভারতীয় পোষাক দেখলেও চমকায় না, আত্মীয়ই মনে করে। মস্কোর রাস্তায় বাঙ্গালী পোষাকে ভ্রমণ করার সময় দেখেছি, অনেক মেডেলওয়ালা সামরিক কর্মচারী আমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে অভিবাদন করে অপ্রস্তুত করেছেন। এরা কেবল শ্রেণীভেদ লুপ্ত করেনি, জাতিভেদ, বর্ণভেদও লুপ্ত করেছে।

চার

আমরা একটা 'পাইয়োনীয়র্স ক্যাম্প' দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে কুশলকর্মা কমরেড অকসানা ব্যবস্থা করে ফেললেন। ছোটদের লালন-পালন, শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে এ দেশে নানা রকম পরীক্ষা ও গবেষণা চলেছে, তার কথা বই-এ পড়েছি, কিন্তু শিক্ষা কি ভাবে মানুষের মন ও চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠছে সেটা চোখে দেখা স্বতন্ত্র কথা। মস্কৌ থেকে আমরা রওয়ানা হলাম মোটরে, ৬০ মাইল পথ। চওড়া পীচ-ঢালা মসৃণ রাস্তা। সহরের পর গ্রাম আরম্ভ হ'ল। পথের দু'ধারে বাগান-ঘেরা কৃষকের পুরানো ধরনের কাঠের বাড়ি, দূরে দূরে আধুনিক দোচালা ধরনের বাংলো, সব্জীবাগান ও অবারিত শস্যক্ষেত্র, কোথাও রাই ও গমের শীষ বাতাসে দুলছে। কোথাও বা আলুর ক্ষেত। তারি মাঝে মাঝে বার্চ, পাইনের বন। এখানকার জমি আমাদের দেশের মত আল দিয়ে টুকরো টুকরো করা নয়। দিগন্তে শ্যামল বনরেখাবলয়িত প্রসারিত শস্যক্ষেত্রগুলি দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। ক্রমে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তায় আসা গেল। গ্রামের মধ্য দিয়ে বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছি, বাড়িগুলোর উঠানে ছাগল ভেড়া মুরগী, পুকুরে হাঁস, বাইরে চেয়ারে বসে মেয়েরা উল বুনছে, ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। সব চলচ্চিত্রের ছবির মত দু'পাশে সরে যাচ্ছে।

একটা বৃহৎ গ্রামের একপ্রান্তে উঁচু ডাঙ্গা জমির ওপর ছেলে-মেয়েরা শিবির স্থাপন করেছে। স্থানীয় স্কুলবাড়ি ছুটোতে শোবার ব্যবস্থা, এ ছাড়া খাওয়া পড়াশুনা খেলাধুলার স্বতন্ত্র ঘর আছে। চারদিক অজস্র হলদে, সাদা বেগুনী ফুলে ছেয়ে আছে, তার পর নানা রকম গাছপালা। এ অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে ফুল-লতাপাতা আর লাল পতাকা দিয়ে সাজানো তোরণদ্বারে ছেলে-মেয়েরা ছুই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিল, আমরা প্রবেশ করতেই ওরা জয়ধ্বনি করে উঠলো। নিজেদের হাতে গড়া ফুলের তোড়া উপহার দিল। হাসি-খুশী ছেলে-মেয়েদের কি নিঃসঙ্কোচ আচরণ। আমাদের যেন কত পরিচিত। একটি ঘরে আমাদের নিয়ে গেল। এখানে একধারে ক্ষুদে বৈজ্ঞানিকরা কীট, পতঙ্গ, প্রজাপতি, নানা রকম গাছের পাতা বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে। নিজেদের আঁকা ছবিতে দেয়াল ভরে ফেলছে ; মাটি দিয়ে খেলনা তৈরী করেছে, সেলাই ও বোনার কাজও আছে। একধারে একটা পিয়ানো, সমবেত সঙ্গীত হ'ল। আগ্রহভরে সব দেখতে লাগলাম। নয় থেকে পনর বছরের প্রায় একশ' ছেলে-মেয়ে মস্কৌ থেকে এই শিবিরে এসেছে। এরা লেখক সাংবাদিক ও কবিদের ছেলেমেয়ে।

এদের সঙ্গে আমরা গল্প জমিয়ে তুললাম। শিবির-চালনা, খাওয়াদাওয়া রান্না পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ছোটদের সাহায্য করা এ সব ভার নিজেরাই ভাগ করে নিয়েছে। পরিদর্শিকা ও শিক্ষয়িত্রীরা আছেন। নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা, ক্লাস চলে।

দল বেঁধে এরা গ্রাম প্রদক্ষিণে যায়, প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে বসে দেশের গঠন-কাজের গল্প করে। এদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম, সোবিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক প্রবণতাকে সযত্নে বাড়িয়ে চলেছে। নয়-দশ বছর বয়সেই ছেলে-মেয়েরা মোটামুটি জীবনের লক্ষ্য বুঝতে পারে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পী লেখক বা কারিগর কে কি হবে। সেই ভাবে এদের স্কুলের শিক্ষায় প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে লালন করা হয়। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের মত হৃদয়াবেগ ও বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগহীন পড়া মুখস্ত করার পাইকারী ব্যবস্থা এখানে নেই। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীতে ছেলেদের মনে জ্ঞান লাভ করবার, জানবার কোন কৌতূহলই উদ্রিক্ত হয় না। এরা কেবল নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের পড়া মুখস্ত করে, যথাসময়ে তারই পুনরাবৃত্তি করে পাশের নম্বর সংগ্রহ করে। এখানে শিক্ষার গোড়ার কথাই হ'ল, মানুষ তৈরী করা, পরীক্ষায় পাশ করান নয়। গাছ বেড়ে ওঠে প্রাকৃতিক নিয়মে, তবু চারা অবস্থায় তাকে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হয়, জল ও সূর্যের আলোর ব্যবস্থা করতে হয়। এরাও তেমনি ভাবে মানবশিশুর ভিতরের শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, তার বাড়তির প্রবণতা কোন্ দিকে লক্ষ্য করে।

আশ্চর্য হ'লাম, এই সব কিশোর-কিশোরীরা তাদের দেশের কত খবর রাখে। এরা কল-কারখানা হাসপাতাল যান্ত্রিক চাষের প্রণালী, এ সব দেখেছে। মানুষকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে

উন্নত করার জন্য দেশব্যাপী যে উদ্যম চলেছে, একদিন তারা তার ভার পাবার যোগ্যতা লাভ করবে, এই এদের উচ্চাশা। এদের কথা শুনি, আর আমার দেশের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় মানব-জীবনের নির্দয় অপচয়ের কথা ভাবি। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে সরকারী খরচে শিক্ষার আবশ্যিক ব্যবস্থা। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে কেউ যায় কলেজে, কেউ বা কর্মশালায় প্রবেশ করে। কলেজ বা স্কুল থেকে পাশ করে কেউ বেকার থাকে না। এদিকে আমাদের দেশে ছেলেরা আই. এস. সি. পাশ করেও জানে না যে, সে কি হবে, কোন পথে যাবে! মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়রিং কলেজে ভর্তি হওয়া তো লটারীর টিকিট পাওয়ার মত দুর্লভ সৌভাগ্য। শিক্ষিত সুস্থকায় যুবক-যুবতীকে ওদেশে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে চাকুরীর জন্য তোষামোদ করে দ্বারে দ্বারে ফিরতে হয় না। বেকারী, দারিদ্র্য ও অচরিতার্থতার জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে, সোবিয়েত রাশিয়ার যৌবন আমাদের দেশের মত হতোদ্যম নৈরাশ্যে ম্রিয়মান নয়। শিক্ষাশালা থেকে বেরিয়ে আসলেই তাকে বরণ করার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের কর্মশালার দ্বার উন্মুক্ত।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, আমাদের বিদায় নেবার সময় হ'ল। এঁরা না খাইয়ে ছাড়বেন না। গ্রামের মাতব্বরেরা এসেছেন। সস্ত্রীক এক জন প্রাচীন ডাক্তার এসেছেন। জারের আমলে বাইরে কাটিয়েছেন, ইংরাজী জানেন। এঁর সঙ্গে পুরানো দিনের গল্প করতে করতে আমরা সুসজ্জিত টেবিলে বসে গেলাম। মেয়েরা পরিবেশন করছিলেন, তাঁরাও এসে অতিথিদের পাশে বসে

গেলেন। এটা খাও ওটা খাও বলে অনুরোধ, ঠিক আমাদের দেশের মেয়েদের মতই। পশ্চিমী শিষ্টাচারের আড়ষ্টতা নেই। আমার পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, দীর্ঘদেহ উন্নত নাসা আয়ত নীল চক্ষু সর্বাবয়ব সুঠাম ও হাস্য পরিহাসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে; এমন সময় আমি বললাম, 'তুমি রূপে লক্ষ্মী, গুণেও হয়তো সরস্বতী, বিয়ে করনি কেন? তোমার পাণিপ্রার্থীর নিশ্চয়ই অভাব নেই।'

পলকে ওর মুখে বিষাদের ছায়া নামলো। গাঢ় স্বরে বললে, 'বিয়ে হয়েছিল, এখন বিধবা, গত যুদ্ধে আমার স্বামী মারা গেছে।'

'বিধবা বিবাহ তো তোমাদের সমাজে অগৌরবের নয়।'

'নিশ্চয়ই নয়। যুক্তির দিক দিয়ে যখন চিন্তা করি, তখন বুঝি এই বৈধব্যের কোন মানে হয় না। কিন্তু হৃদয়াবেগ স্বতন্ত্র জিনিষ। আজ ছয় বছরেও তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও বিশ্বাস নিয়ে আমরা নীড় রচনা করেছিলাম। স্বদেশপ্রেমিক সাহসী যুবক, ফাসিস্ত দস্যুদের আক্রমণ থেকে পিতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধে ছুটে গেল। বীরত্ব ও যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য ও তিনটে সোনার মেডেল পেয়েছিল। আমাদের মহান নেতা কমরেড স্তালিনের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত মেডেলটা আমি আজীবন বুকে বহন করবো। ভাবি, এত দিনে হয়তো আমাদের ছেলেপুলে হত। তা যখন হয়নি, তখন এই পাইয়োনীয়র্সদের মধ্যেই আমার ছেলে-মেয়েদের পেয়েছি; এদের সেবা করি, আর শান্তির কথা বলি। যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর সর্বনাশের।' বলতে-বলতে

জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের দেশেও তো শুনি বিস্তর বিধবা আছে, তারা কি করে জীবন কাটায় ?'

'কি আর করবে। আত্মীয়-গৃহে দাসীবৃত্তি করে, নয়তো তীর্থস্থানে ভিক্ষে করে খায়, সমাজে তাদের স্থান—' আর বলতে পারলাম না, কথা আটকে গেল।

'কেন তোমরা তো তাদের শিক্ষয়িত্রী, নার্স করতে পার। যেমন আমাদের দেশে শিশুপালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন আছে, তোমাদের তা কি নেই ! মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ?'

'না নেই, ও সব হতে অনেক দেরী আছে।'

মেয়েটি উন্মনা হয়ে বলে, 'আমরা যদি তাদের পেতাম, শিখিয়ে দিতাম, স্বাধীন দেশের মানুষ কি করে তৈরী করতে হয়।' কথার মোড় ঘুরিয়ে ও জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, তোমাদের দেশের মেয়েরা শান্তি আন্দোলন করে ? আর একটা বিশ্বযুদ্ধ না বাধে, আমরা সে জন্যে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গঠন করছি।'

'আমাদের দেশে শিক্ষিতা মেয়েরা যুদ্ধবিরোধী। আমরাও যুদ্ধ চাইনে। কেন না, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে নিরন্ন রোগতপ্ত দরিদ্র ভারতে মৃত্যুর মহামারী লেগে যাবে। আমরা শান্তিরক্ষার জন্য তোমাদের সাথেই চলেছি।'

মেয়েটি আগ্রহে আমার হাত চেপে ধরে বললে, 'দেশে গিয়ে তোমাদের মেয়েদের বলো, যুদ্ধ বড় ভয়াবহ। আমাদের দেশে আমার মত কত হতভাগিনী স্বামী-পুত্র হারিয়েছে, কত সুখের ঘর ভেঙ্গে গেছে। যে বুলেট আমার স্বামীর বুকে বিঁধেছিল,

সেটা আমার পাঁজরে এখনো বিঁধে আছে। সীসের মত ভারী, বুক ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। সব দেশের মেয়েরা এক হয়ে দাঁড়ালে যুদ্ধ রোখা সম্ভব।'

পাইয়োনীয়র্সরা 'ভারত-সোবিয়েত মৈত্রী দৃঢ় হোক' ধ্বনি দিয়ে আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানালে। মস্কৌ-এ ফিরছি। নির্মল আকাশে অসংখ্য তারা ঝল্‌মল্ করছে। এমনি পলকহীন দৃষ্টিতে ওরাও এক দিন দেখেছে, নাৎসী বর্বরতার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। রুশ-যুবতীর বেদনার্ত চোখ দুটি যেন অজস্র হয়ে অনন্ত শূন্যে শান্তির মৌন আকূতি জানাচ্ছে।

পাঁচ

প্রাক্-বিপ্লব যুগের রুশ-সাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সকলেরই জানা। পুষকিন, গোগোল, টলস্টয়, তুর্গেনিভ, গর্কির রচনার সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যামোদীদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। রুশীয় সাহিত্যের এই প্রাচীন সম্পদ যা এক দিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঐতিহ্যের ধারায় সমসাময়িক সোবিয়েত সাহিত্যও স্বদেশের গণ্ডী অতিক্রম করে সকল দেশের প্রগতিশীল নর-নারীর চিত্তে রেখাপাত করছে। শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থায় নবযুগের নর-নারীর রূপান্তরিত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনায় অনুরঞ্জিত আধুনিক রুশ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বিশ্ব-মানবের বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর যোগসূত্র অব্যাহত রয়েছে। এই কারণেই বিপ্লবোত্তর যুগের কবি নাট্যকার লেখকেরা আমাদের কাছে অপরিচয়ের বিস্ময় নন।

সোবিয়েত রাশিয়ায় আমরা মস্কো লেখক-সঙ্ঘের অতিথিরূপে গিয়েছিলাম। এই কারণে নানা উপলক্ষে এঁদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, স্তালিনগ্রাদ, তিবলিসি, তাসকেণ্ট প্রভৃতি সহরে লেখক, কবি, নাট্যকারদের ইউনিয়ন আমাদের অভ্যর্থনা করেছেন। কেবল

ভাবের আদান-প্রদানের শিষ্টাচার নয়, বর্তমান যুগের সঙ্কট ও সমস্যাগুলি সমাধানে সকল দেশের সাহিত্যিকদের কর্তব্য কি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার উপায় কি, এসব নিয়েও আলোচনা চলতো। দেখেছি, কোন বিশেষ মতের পোষকতা করবার জন্য এঁরা সাহিত্যকে একই মাপে ঢালাই বা যাচাই করেন না। ডিকেন্স, আনাতোল ফ্রাঁস, সেক্সপিয়র, বায়রন, গেটে প্রভৃতির রচনা এখানে খুবই জনপ্রিয়। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার এঁদের আগ্রহ অকৃত্রিম। অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এঁদের মনের প্রসারতা দেখে মুগ্ধ হলাম। সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে এঁরা দেশ-বিদেশের গণ্ডি অতিক্রম করে, সর্বমানবের কল্যাণে অতীতের রক্ষণশীলতার কুহকমুক্ত জ্ঞানের সাধনাকে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যের মধ্যে সর্বকালের একটা আনন্দরূপ আছে, যে তীর্থে প্রাচীন ও নবীনের সৃষ্টির অর্ঘ্য এক সমন্বয়ের মধ্যে বিধৃত, এইটি অস্বীকার করলে রুচিবিকার ঘটে, এবং তা এড়াতে হলে ভাবের আদানপ্রদান চাই। এই কারণেই এঁরা রামায়ন মহাভারত, কালিদাস অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত ভাষার আবরণে অতীতের মহার্ঘ চিন্তাসম্পদ, এঁরা স্বদেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চলতি ভাষা এবং আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে এঁদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য খুব বেশী। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দু সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ, কিষেণচন্দ, মুলুকরাজ আনন্দ, ভবানী

ভট্টাচার্যের রচনা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এর পাঠক সংখ্যা কম নয়। শ্রমিকদের সংস্কৃতি ভবনগুলির লাইব্রেরীতে এসব বই দেখেছি। সোবিয়েতের সাধারণ মানুষের পাঠস্পৃহা, সকল দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি এদের অনুরাগ প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্রনাথ কোন উপলক্ষ্যে বলেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টি যৌথ কারবার নয় বলেই একক নিঃসঙ্গ সাধনায় আমরা সাহিত্যসৃষ্টি করতে পেরেছি। বৈষয়িক ক্ষেত্রে সকলে মিলে কাজ করবার অপটুতা সত্ত্বেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যমে বাঙ্গালীর সাফল্য স্বীকার করতেই হবে। কথাটা আমিও স্বীকার করি কিন্তু এও তো সত্য, এই শতকরা ৮৫ জন নিরক্ষরের দেশে সাধারণ কবি ও লেখকদের তো কথাই নেই, রবীন্দ্রনাথের রচনার রস কয় জন উপভোগ করতে পারে? এখানে সমষ্টি মানবের মনের দ্বার বাতায়ন রুদ্ধ। আমাদের দেশে একক চেষ্টায় যেখানে সাহিত্যসাধনা সফল হয়েছে, তার সার্থকতার পিছনে একটা বেদনার ইতিহাসও আছে। গিরি-নির্ঝরিণীর কল্লোলিত নৃত্যের নুপূর নিক্কণে, পাষাণবন্ধ ভেদ করার বেদনার সুরও ধ্বনিত হয়। এমন দিন ছিল যখন কবিরা ছিলেন সভাকবি। সম্রাট বা সামন্ত নৃপতিদের স্তাবক ও বিদূষক হয়ে, তাঁদের প্রসাদ-লালিত কবিরা স্তুতিবাদ রচনার ফাঁকে ফাঁকে কাব্য রচনা করতেন। কালিদাস, বাণভট্ট থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই ধারাই চলেছে। বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার শ্রেণীর মধ্যেও এই ধারা গত শতাব্দীতেও ক্ষীণভাবে বয়েছে। বিদেশী শাসন ও ইংরাজী

শিক্ষিতবর্গের অবজ্ঞা সত্ত্বেও সাহিত্যপ্রতিভার যে বিকাশ হ'ল, তাও জমিদারী ও সরকারী চাকুরীর আওতায়। পরবর্তী যুগে দেখলাম, হঠাৎ টাকা করা এক শ্রেণীর মূর্খ ও আত্মম্ভরী ধনীর আবির্ভাব ; সাহিত্য শিল্পকলা এদের নিকট অবজ্ঞেয়। অথচ গণতান্ত্রিক জনতা মহারাজও তাঁর সিংহাসন পাননি। এই প্রতিকূলতা ঠেলে যাঁরা জনপ্রিয় হয়েছেন, তাঁদের বন্দনা করবার সময় আমার মনে হয়, সেই সব কবি ও সাহিত্যিকের কথা, যারা দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, উদরান্নের জন্য রক্তপিপাসু প্রকাশকের নিকট সামান্য মূল্যে গ্রন্থ বেচে দিয়েছে, অথবা আশ্বাস পেয়ে বঞ্চিত হয়েছে। যে মনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের ফসল ফলবে, সেই মন চতুর বিষয়ীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে মরুভূমি হয়ে গেছে। কল্পনাপ্রবণ সংবেদনশীল তরুণ মন, যেখানে সোনা ফলতো, সেখানে অচরিতার্থতার গ্লানির ক্লেদ দীর্ঘশ্বাসে দুলে ওঠে। কে নভেল লিখে পয়সা করলো, কে সিনেমার গল্প লিখে বাড়ি-গাড়ি করলো, আমরা তাই চোখ মেলে দেখি। কিন্তু দেখিনে, একটু সহানুভূতি সাহায্য এবং জীবিকার নিষ্ঠুর প্রয়াস থেকে অবকাশ পেলে যারা জাতীয় সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করতে পারতো, তারা ঝরে যায়, সরে যায়, কালের চিহ্নহীন পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যৌবনে কবি গোবিন্দদাসকে তিন দিন চিড়ে খাওয়ার পর অভুক্ত অবস্থায় মরতে দেখেছি, সুরেশ সমাজপতিকে প্রায় অচিকিৎসায় চিরনিদ্রায় অভিভূত হতে দেখেছি। মলিন শয্যাশায়ী রুগ্ন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার হাত

ধরে বলতে শুনেছি, "আমার জন্য তোরা চাঁদার খাতা খুলিসনি। হয়তো ২৭৷৷/০ আনা চাঁদা উঠবে, সে তো মরণাধিক অপমান।" পরিণত বয়সে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকেও নিদারুণ যক্ষ্মা রোগে প্রায় অচিকিৎসায় মারা যেতে দেখলাম। রাগ বা অভিমান করে এ সব কথা বলছিনে, যে পাটোয়ারী বুদ্ধি, সাহিত্যিক লেখকদের অপমান করে বঞ্চনা করে, কটূভাষী সাহিত্যিক ভাড়াটে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে পরিবাদ রটনা করে, তাদের আমি অভিশাপ দেবো না। যে সমাজের মধ্যে জন্মেছি, তার মূঢ়তাকে ক্ষমা করবো ; কিন্তু দেশের সাহিত্যসেবকদের বেদনা ও অপচয় তো ভুলে থাকতে পারিনে। ভাবি, সিনেমার ছবির চটকদার খেলো ও ক্ষণিক উন্মাদনা আর রেডিও যন্ত্রের সঙ্গীতের নামে রাসভ নিনাদ তার স্থূল রুচি নিয়ে বর্তমানকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, এই কি আমাদের বিধিলিপি !

সোবিয়েত রাশিয়ার অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে সাহিত্যিক লেখক সাংবাদিকদের প্রচুর উপার্জন ও প্রভূত সম্মান। দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের মানদণ্ড উন্নত করবার ভার যাঁদের হাতে, তাঁরা যাতে নিরুদ্বেগ স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারেন, সেদিকে সোবিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজ অবহিত। অন্যান্য বৃত্তিজীবী শ্রমিকদের মত এঁদের সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন আছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এঁরা অবশ্য ফরমাইসী সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, তবে লেখকদের বৃত্তিগত স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করেন। এখানে বুভুক্ষু লেখকদের সংবাদপত্রের মালিক বা প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর

দৈনিক সপ্তাহিক মাসিক সাময়িক পত্রিকা আছে, লেখক-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে রুশ ও অন্যান্য ভাষায় বই প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজী, ফরাসী, জর্মন প্রভৃতি ভাষা থেকে অজস্র বই অনুবাদ করা হয়। এর জন্য সকলেই প্রায় সমান মজুরী পেয়ে থাকেন। লেখকের অবস্থা বুঝে প্রকাশকদের দাঁও মারবার দর কষাকষি নেই।

বিখ্যাত "লিটারারি গেজেটের" সম্পাদক, কবি ও নাট্যকার সিমোনভের আমন্ত্রণে আমরা একদিন "গর্কী লিটারারি ইনস্টিটিউট" দেখতে গেলাম। তরুণ-তরুণীদের কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকরূপে তৈরী করে তুলবার এই প্রতিষ্ঠানটি লেখক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছাত্র-জীবনে যাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের এখানে শিক্ষা ও আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। সাহিত্য রচনা ছাড়াও, শিক্ষার্থীদের ভাষাতত্ত্ব, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস, মার্কসীয় দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও অধ্যাপকগণ এখানে নিয়মিত ক্লাস নেন, ছাত্রদের রচনা সংশোধন করেন। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭০ জন। এখানে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন ও শিক্ষানবীসী করতে হয়। ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হয় না, বরং গুণানুযায়ী ২৫০ থেকে ৮০০ রুবল ভাতা পায়। বিনা ভাড়ায় ট্রামে বাসে ট্রেনে যাতায়াত এবং সরকারী ভোজনালয়ে সস্তা দামে খাবার সুবিধেও এরা পায়। দেখলাম, বাপ-মার ওপর নির্ভরশীল ছাত্রদের সংখ্যা অতি অল্প।

সহরের মাঝখানে বাগান-ঘেরা একটা পুরানো বাড়ি, চাপা সিঁড়ি বেয়ে আমরা হল-ঘরে প্রবেশ করলাম। ছাত্রেরা ভারত-সোবিয়েত মৈত্রী ও বিশ্বশান্তির জয়ধ্বনি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলো। একটা লম্বা টেবিলের দু'ধারে ছাত্রদের নিয়ে আমরা বসলাম। এরা চা কেক বিস্কুট ফল সরবতের ব্যবস্থা করেছে। ছেলে-মেয়েদের মুখ আগ্রহে ও প্রীতিতে উজ্জ্বল। এরা এই প্রথম ভারতীয় লেখকদের অভ্যর্থনা করার সুযোগ পেয়েছে। এখানে প্রায় সব রিপাবলিকের ছাত্র আছে। রুশ মোঙ্গল কাজাক আর্মানি তুর্কোমান সাইবেরিয়ান জর্জিয়ান উজবেক ছাড়াও, বুলগেরিয়া রুমানিয়ার ছাত্র আছে। একজন অধ্যাপক আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার পর, ছাত্রদের অনুরোধে আমরাও একে একে আত্মপরিচয় দিলাম। এইবার সুরু হ'ল প্রশ্নের পালা। আলোচনা কেবল প্রগতিশীল সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক-শ্রমিকদের আন্দোলন, ভারতের শিক্ষাবিধি, সাহিত্যিকদের অবস্থা এ-সব আমাদের বলতে হ'ল। বৃটিশ আমলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের যে ব্যবস্থা ছিল এখন তা অনেক পরিমাণে শিথিল হয়েছে একথা বলায় এক জন ছাত্র জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতে বিনাবিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে তোমরা আন্দোলন কর কি না? গোঁজামিল দিয়ে জবাব দেওয়া ছাড়া কোন সদুত্তর দিতে পারলাম না। এইবার আমরা প্রশ্ন করতে লাগলাম।

একজন মোঙ্গল যুবককবি বললে, সোবিয়েত প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বে আমাদের কথ্য ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না, কতকগুলি লোকসঙ্গীত ও মুখে মুখে চলতি গল্প গাথা ছিল। সোবিয়েত আমলে আমাদের নিজস্ব বর্ণমালা (রুশ নয়) হয়েছে। মোঙ্গল ভাষায় কবিতা ও সাহিত্য রচিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে মোঙ্গল ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার রচিত কবিতা জনসাধারণ প্রশংসা করায়, মোঙ্গল রিপাবলিক বৃত্তি দিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এখানে পাঠিয়েছেন।

শুনলাম, জারের আমলে মধ্য-এশিয়ায় জাতীয় ভাষার পরিবর্তে জোর করে রুশ ভাষা চালান হ'ত। বিদ্যালয়ে, আপিস-আদালতে দেশী ভাষা চলতো না। সোবিয়েত আমলে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য অতি ক্ষুদ্র উপজাতিদের কথ্য ভাষাকেও উন্নত করে তোলা হয়েছে। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ভাষা জীবন্ত ও গতিশীল হয়ে উঠেছে মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যে। কোথাও মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে জোর করে রুশ ভাষা চালাবার চেষ্টা নেই। এক জন আর্মেনীয়ান যুবতী বললে, এক দিকে তুর্কীদের অত্যাচার, অন্য দিকে জারের পীড়ন-নীতি এই দুই চাপে পড়ে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। সোবিয়েত প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি তার অতীত ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এক জন উজবেক তরুণীর

মুখে ঐ কথাই শুনলাম। মোল্লা-মৌলভীরা আরবি, পারসিক ভাষা চর্চা করতেন; উজবেক ভাষা কেবল কথ্য ভাষা ছিল। আমরা রুশ বর্ণমালা গ্রহণ করে সাহিত্যসৃষ্টি করেছি; নানা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য উজবেক ভাষায় অনুদিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়কলার এত উন্নতি হয়েছে যে, সমস্ত সোবিয়েত রাশিয়ার সংস্কৃতিতে আমরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছি।

এই সব শিক্ষার্থীরা, পাঁচ বছরের অধ্যয়ন শেষ করে 'ডিপ্লোমা' পাবে; তার পর লেখক ও সাংবাদিক সঙ্ঘের সভ্য হয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করবে। অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে জীবিকার অন্বেষণে সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করার নিষ্ঠুর অপচয় এখানে নেই। যৌথ ভাবে এরা সাহিত্যসৃষ্টি করে না, পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নিবিড় ঐক্যের মধ্যে এরা অনুদ্বিগ্ন চিত্তে সাহিত্যসাধনা করে। সে সাধনার প্রস্তুতির মধ্যে কত অধ্যবসায়, কত সহানুভূতি, রাষ্ট্র ও সমাজের কত আনুকূল্য— 'গর্কী সাহিত্য শিক্ষালয়' তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাহিত্য ললিতকলা ও কারুশিল্পের সাধকগণের চিন্তা কল্পনা ও সৃষ্টির ঐশ্বর্য বিস্তারের অবাধ সুযোগের পথ এরা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এদের সাম্প্রতিক সাহিত্য রচনায় যুদ্ধ হিংসা জাতিবিদ্বেষ বর্ণবিদ্বেষের স্থান নেই। সাহিত্যিক ও লেখকদের প্রত্যেক অভ্যর্থনা সভায় তাঁরা ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন, আপনারা দেশে ফিরে গিয়ে আপনাদের সতীর্থদের

বলবেন যে, সোবিয়েতের লেখকেরা মানবমৈত্রী ও বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। মুনাফাশিকারীদের লোভের দ্বারা কলুষিত রাষ্ট্রনীতি বহু মানবের দুর্গতির প্রতি অন্ধ হয়ে আর একটা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে, ভারতের প্রগতিশীল লেখকেরা তার বিরুদ্ধে জনমত সজাগ করে তুলুন। আমরা যখন উত্তরে বলেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমাদের আত্মকর্তৃত্ব ছিল না, ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরশাসনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। তবুও রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ফাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমত সজাগ করেছি, ফাসিজমের নিদারুণ বলদৃপ্ত পরের অধিকার লঙ্ঘনের নির্লজ্জ পাশবিকতা থেকে আপনারা কেবল আত্মরক্ষা করেননি, ইয়োরোপ তথা মানব-সভ্যতাকে বহু ত্যাগস্বীকারে রক্ষা করেছেন; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু আমাদের জীবন খর্ব, দারিদ্র্যে পীড়িত, শিক্ষায় বঞ্চিত; আমাদের লোকসাধারণের বৈষয়িক রিক্ততার মধ্যেও নৈতিক বল আছে, আজ অতলান্তিকের দুই তীর থেকে সভ্যতার প্রতি ভদ্রদায়িত্ববোধহীন যে বিদ্বেষ-বিষ উদগ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করছে, তার অভিসন্ধি আমাদের অজানা নেই, আত্মপ্রকাশ করবার যে স্বাধীনতা বিংশ শতাব্দীর মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র তার কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হয়েছে; এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা আপনাদের সহযাত্রী, আমরাও শান্তি ও বিশ্বমানবের মিলনে বিশ্বাসী— তখনই প্রত্যেক সভায় সমর্থনসূচক করতালিধ্বনি উঠেছে। এশিয়ার প্রতি ভারতের

প্রতি হয় অবজ্ঞা নয় মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে অনুকম্পা, ইয়োরোপ-আমেরিকার এই মনোভাবের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালের পরিচয়। কিন্তু রুশ লেখকদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচ্যের প্রতি এদের শ্রদ্ধা অনুরাগ ও আগ্রহ দেখে আনন্দিত হয়েছি।

ছয়

বিশাল মস্কৌ সহরে অনেক কিছুই আছে। যতটা পারি দেখে নিচ্ছি। নানা প্রকার ম্যুজিয়মই আছে দশ-বারটা। আমরা গোটা চারেক দেখলাম। লেনিন ম্যুজিয়মে বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর স্মৃতির নিদর্শনগুলি স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। তাঁর গুলীবিদ্ধ ওভারকোট, ব্যবহার্য সব জিনিষই রয়েছে। স্তালিন তাঁর ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা দেশ থেকে কত উপহার পেয়েছেন, একটি ম্যুজিয়ম তাতেই ভরে উঠেছে। লেনিন লাইব্রেরী পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ পুস্তকালয়। বসে পড়বার ঘরগুলি প্রশস্ত, হু'হাজার লোকের বসবার আসন। পাঁচশ'র অধিক কর্মচারী বই-এর তদারক করে। বই পাঠকের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য বহু লিফ্‌ট আছে, আর আছে ক্ষুদে রেলওয়ে।

রোজই জানলা দিয়ে ক্রেমলিন প্রাসাদ দেখি। জারের আমলের প্রাচীন গির্জাগুলির চূড়া, সুউচ্চ প্রাচীরের মিনার, পুরানো প্রাসাদ ও আধুনিক সরকারী ভবন দেখা যায়। দিল্লী বা আগ্রার কেল্লা-প্রাসাদ অপেক্ষাও আয়তন ও জাঁকজমক এর অনেক বেশী। ১৮শ শতাব্দীতে রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গে স্থানান্তরিত হলেও ক্রেমলিনের বৈভব ম্লান হয়নি। সোবিয়েত আমলে এর খ্যাতি তো আজ জগৎজোড়া। এই বিশাল প্রাসাদ-দুর্গের এক কোণে

অতি সাধারণ এক অট্টালিকায় তিনখানা সাদাসিধে কক্ষে স্তালিন থাকেন। ৪ঠা জুলাই ছাড়পত্র নিয়ে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দরজা দিয়ে ক্রেমলিনে প্রবেশ করলাম। আমাদের মত আরও অনেক দল নিজস্ব গাইড নিয়ে দেখতে এসেছে। পুরাতন জারদের প্রাসাদের বেশীর ভাগ ম্যুজিয়ম। অতীতের প্রবল প্রতাপ জারদের মণিমাণিক্যখচিত মুকুট ভূষণ ঘোড়ার সোনার সাজ স্বর্ণ ও রৌপ্য-পাত্র কত অলঙ্কার! প্রধান পাদ্রীদের বসন-ভূষণও জারের চেয়ে কোন অংশে নিষ্প্রভ নয়। ধর্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্র একত্র হাত মিলিয়ে জনসাধারণকে কি ভাবে শোষণ ও শাসন করতো তার বহু নিদর্শন দেখলাম। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের গোড়ার দিকে গল্প শুনতাম, বলশেভিকরা জারদের ধনরত্ন শিল্পকলার নিদর্শন সব লুটপাট করে নিয়েছে। এখানে এবং লেনিনগ্রাদের উইনটার প্যালেসে তার বিপরীত ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করলাম। চার শতাব্দীর সম্রাটদের সংগৃহীত এবং পারস্য ও তুরস্কের শাহ সুলতানদের হীরামুক্তাখচিত পানপাত্র পেটিকা প্রভৃতি এবং ফরাসী অস্ট্রিয়া জর্মন সম্রাটদের উপহার-সামগ্রী এরা সযত্নে রক্ষা করেছে। সম্রাটদের প্রাসাদের সাজসজ্জা আসবাব দেয়াল ও ছাদের স্বর্ণখচিত কারুকার্য ফরাসী ও ইতালীয় শিল্পীদের অনবদ্য সৃষ্টি, সবই অক্ষত রয়েছে। ছেলেবেলায় পড়া পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য পদার্থ মস্কো নগরীর বিশাল ঘণ্টাও তেমনি ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। ঐশ্বর্য বিলাস প্রতাপ আজ কেবল তার বিষাদময় নিদর্শন রেখে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরনিদ্রিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবের কঙ্কালের মত।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে নিষ্ঠুর শোষক-শ্রেণীর মধ্যেও অর্ধোন্মাদ উদার খেয়ালী মানুষ জন্মেছে। আমাদের দেশে দয়ালু দাতা দরিদ্র ও নিপীড়িতের বান্ধব এমন অনেক রাজা জমিদার এমন কি দস্যুদের কাহিনীও প্রচলিত আছে। জার সাম্রাজ্যেও এমন একটি মানুষের কাহিনী শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আমাদের গাইড বা পরিচালিকা কমরেড অকসানা দেবী তাঁর গল্পটা রাতে খাবার টেবিলে আমাদের শোনালেন এবং আশ্বাস দিলেন, পরদিন সকালেই তাঁর প্রাসাদে যাওয়া হবে। সেটাও একটা ম্যুজিয়ম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাত জমিদার, নাম আস্তানফিনো। বিরাট জমিদারী এবং দু'লক্ষ ক্রীতদাসের মালিক। ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ রুশ-অভিজাতদের ফ্যাসন ছিল। বসনে-ভূষণে চাল-চলনে আহারে-বিহারে গৃহনির্মাণ ও আসবাবে সর্বত্র ফরাসীর নকল। আস্তানফিনোও যুগধর্ম প্রভাবে ফরাসী সংস্কৃতির ভাবধারার বারি অঞ্জলী ভরে পান করেছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়েই ইনি সঙ্কল্প করলেন, সার্ফ বা ভূমিদাসদের মুক্তি দেবেন। কিন্তু অসহায় পরনির্ভর মানুষগুলি দাসপ্রথায় পশুর মত কায়ক্লেশে বেঁচে আছে, মুক্তি পেলেই যে মারা পড়বে! ইনি এদের নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সমাজের সর্বাধিক নীচু স্তরের মানুষের মধ্য থেকে কবি সাহিত্যিক স্থপতি চিত্রশিল্পী অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নর্তকী সৃষ্টি হ'ল। আস্তানফিনো ছিলেন কলারসিক ও রঙ্গমঞ্চপ্রিয়। মস্কো-এ ইনি সাতটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা

করেন। এঁর দাসেরা মস্কোর উপকণ্ঠে যে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, নানা চিত্র ভাস্কর্য ও কারুকার্য দিয়ে সুষমামণ্ডিত করেছিল, তা আজ সোবিয়েত সরকার ম্যুজিয়মে পরিণত করেছেন। ইনি একজন রূপসী ও বিদুষী দাসীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অতি ধনী হয়েও তাকে সামাজিক মর্যাদা দিতে পারেননি। ক্ষোভে ও অপমানে মহিলা আত্মহত্যা করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর শিল্পীদের জার গভর্নমেণ্ট সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এত বড় অনাচার অভিজাত সমাজ সইতে পারলো না। আস্তানফিনো ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

মস্কৌ-এর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিস্তীর্ণ বাগানের মধ্যে আস্তানফিনোর প্রাসাদ। সম্মুখে একটা হ্রদ, ছোট ছোট ডিঙ্গী নৌকা নিয়ে তরুণ-তরুণীরা বাইচ খেলায় মেতেছে। এক কোণে একটা বৃহৎ গীর্জা, অযত্নে পড়ে আছে। প্রাসাদের পাশে দোকান-পশার খাবার সরবৎ ও কুলপী বরফ। দলে দলে দর্শনার্থী নরনারীর ভীড়। আমরা পশমের জুতো পরে প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। শক্ত জুতোর ঘষায় মেঝের কাঠের রকমারী নক্সা ক্ষয়ে না যায়, সেই জন্য এ ব্যবস্থা। এ প্রাসাদটি দাসেরাই তৈরী করেছে। কাঠের স্বাভাবিক নানা রং-এর টুকরো দিয়ে বিচিত্র নক্সায় মেঝেগুলোর অপরূপ শোভা, চিত্র ও ভাস্কর্যের কি সংগ্রহ! এই প্রাসাদ কত সুন্দর, তা হায়দ্রাবাদের ফলকনামা প্রাসাদ বা বরোদার রাজপ্রাসাদ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কিছুটা অনুমান করতে পারবেন। ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে সংগৃহীত বিচিত্র

দ্রব্যসম্ভারের কি আশ্চর্য সমাবেশ। এর বৃহৎ নাট্যশালা ও নাচঘরের রূপসজ্জা নয়নময় হয়ে দেখবার মত। কলারসিক এবং সেকালের প্রগতিশীল অভিজাত বলেই এর কীর্তি সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে।

৫ই জুলাই সকালে আমরা সরকারী কৃষি-গবেষণাগার দেখবার জন্য গর্কী গ্রামে যাত্রা করলাম। ৫০।৬০ মাইল পথ। সহরতলী ছাড়বার পর গ্রাম আরম্ভ হ'ল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের বাঙ্গলা দেশের মত নয়। উঁচু-নীচু তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে বার্চ পাইনের বন, ছোট ছোট ক্ষীণস্রোতা নদী, নদীতে শত শত সাদা হাস সাঁতার দিচ্ছে, কতকগুলো চোখ বুজে ডাঙ্গায় রোদ পোহাচ্ছে। কৃষক যুবক-যুবতীরা মন্থরগতি ঘোড়ার গাড়িতে বসে গান গাইতে গাইতে চলেছে, রঙ্গীন পোষাক-পরা কৃষক-নারীরা আলু ও সব্জী ক্ষেতে কাজ বন্ধ করে গ্রীবা বাঁকিয়ে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে আমাদের দেখে নিচ্ছে, কোথাও গাছতলায় সুস্থ ও সবল দেহ ছেলেমেয়েরা খেলার আসর হাস্য-কৌতুকে জমিয়ে তুলেছে, এমনি টুকরো টুকরো ছবি চলে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে, দূরে ধূসর পাহাড়ের স্থির পটভূমির ওপর প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্টি তার বিশিষ্ট রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত। আসানসোল থেকে হাজারীবাগ মোটর ভ্রমণের কথা মনে পড়ছিল।

দিগন্তবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের এক পাশে কৃষি-গবেষণাগার। লিসিঙ্কো পদ্ধতিতে গম আর রাই নিয়ে গবেষণা চলছে। অধ্যক্ষ গম ও রাই-এর মিশ্রণে উৎপন্ন অথচ রাই-এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর এবং

বেশী ফলনের গাছ দেখালেন। বিজ্ঞানকে কৃষিকাজে প্রয়োগ করে দীর্ঘকালের গবেষণা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে কোন্ ফল ফুল ফসলের কতটা উন্নতি হয়েছে তা বোঝালেন। এ সব বুঝবার মত পাণ্ডিত্য আমাদের অবশ্য কারো নেই, তবে সাংবাদিকসুলভ সর্ববিদ্যাবিশারদের ভান করে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, উত্তর মেরুর কাছাকাছি স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালে দ্রুত গম উৎপাদনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে ; তবে একবার গম বুনে ২।৩ বার ফসল পাওয়া এখনও সাফল্যলাভ করেনি। ফলের বাগানে বিশেষ সার প্রয়োগ এবং কলম করে, আপেল পীয়ার প্রভৃতির ফলন ও আয়তন বেড়েছে দেখলাম।

এর পর অধ্যক্ষ আমাদের গো-পালনাগারে নিয়ে গেলেন। কয়েকটি বিভিন্ন জাতের ষাঁড় আর শ'দেড়েক গাভী রয়েছে। এখানে মিশ্র প্রজননে গোবংশের উন্নতির চেষ্টা চলছে। এ রকম অতিকায় গাভী আমি জীবনে দেখিনি। দৈনিক আধমণ থেকে ত্রিশ সের দুধ দেয় শুনে বিশ্বাস না হয়ে উপায় নেই। এখান থেকে দেশের নানা কেন্দ্রে উৎকৃষ্ট ষাঁড় ও গরু পাঠান হয়। আমাদের দেশের খর্বকায়া, বিশুষ্কস্তন্যা গো-মাতাদের রূপ চকিতে মনে পড়ে গেল। 'গৌ মাতাকে লিয়ে' আমরা নরহত্যাকে পুণ্য মনে করি, না খেতে দিয়ে বাছুর মেরে ফেলা, ফুঁকো দিয়ে দুধ দোহাকে আমরা পাপ মনে করিনে। গরুর প্রতি আমাদের দরদের একমাত্র প্রমাণ আইন সভায় আমরা গাভী হত্যা আইনতঃ নিষিদ্ধ করেছি। কিন্তু কেবল রাশিয়ায় কেন, সমগ্র ইয়োরোপে

গো-খাদকদের গো-পালনের সযত্ন ব্যবস্থা দেখলে লজ্জায় মাথা নোয়াতে হয়।

অধ্যক্ষের সঙ্গে আমরা কৃষিক্ষেত্রে গেলাম। দিগন্তবিস্তীর্ণ ঊষর স্তেপভূমি, হাজার বছর ধরে বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল। বার্চ, পাইন ও ওকের অরণ্যবলয় তৈরী করে, তীব্র শুষ্ক বায়ু রোধ করে, সেচ ব্যবস্থায় ক্রমে স্তেপভূমি শস্যশালিনী হয়ে উঠছে। অনুর্বর প্রান্তরকে জয় করার সংগ্রাম চলেছে, প্রধান হাতিয়ার ওক-গাছের চারাগুলি সবল হয়ে উঠছে। এক একটি অরণ্যবলয় তৈরী হবে, আর শস্যক্ষেত্র এগিয়ে যাবে। বহু দিনের পতিত জমিতে বুক-সমান উঁচু রাই-এর ক্ষেতে দাঁড়িয়ে মনে হতে লাগলো, এরা পারছে, কেন না রাষ্ট্র মাত্র ত্রিশ বছরে আদিম যুগের কৃষি ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানের যন্ত্রযুগে এনে ফেলেছে। আর আমাদের দেশের কৃষকের এখনো শ্রীরামচন্দ্র বা অশোকের যুগের লাঙ্গল-বলদ ও দৈবের দয়ায় বৃষ্টিই ভরসা। বিদেশ থেকে আমরা অন্ন কিনি, অন্নসৃষ্টির যন্ত্র কিনি না। আমাদের আহার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকবার প্রথাটা আদিম যুগেই রয়ে গেল; কিন্তু মরবার ও মারবার অতি আধুনিক মারণযন্ত্রগুলি আমরা বিদেশ থেকে প্রচুর আমদানী করি। কৃষকের ছেলে আকবরের আমলের কাঠের লাঙ্গল নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে যায়, কিন্তু সে যদি সৈন্য ও পুলিশ দলে ভর্তি হয়, তার হাতে সে যুগের লাঠী সড়কী বল্লমের পরিবর্তে শোভা পায় দ্রুত মৃত্যুস্রাবী রাইফেল।

এই গর্কী গ্রামেই একটা বাড়িতে লেনিন (১৯১৮-২৪) বাস

করতেন। প্রায় একশ' বিঘা উপবন ও উদ্যানের মধ্যে একটা দোতলা সুগঠিত বাড়ি, পশ্চিমে নীল পাইনের বন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দেখলেই বোঝা যায়, প্রাক্-বিপ্লব যুগে কোন ধনী অভিজাতের উদ্যান-বাটিকা ছিল। বাড়ির বাইরে চাকরদের থাকবার এবং পাকশালা প্রভৃতির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। ইদানীং পাহারাদার সোবিয়েত পল্টনেরা এখানে থাকে। চারিদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা, কেউ কোন জিনিস গাছপালা না নষ্ট করে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নবীন রাশিয়ার এটা এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র। দলে দলে নরনারী আসছে, বাসে লরীতে গাড়িতে। এ বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে ধূমপান করা নিষেধ। লেনিনের লাইব্রেরী, শয়নকক্ষ, বসবার ঘরের সব আসবাব সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর চিঠিপত্র, হাতের টুকিটাকী লেখা, তাঁর ছবি এ সব পরিদর্শিকা বুঝিয়ে দিলেন। এখানে একটা রেকর্ডে লেনিনের বক্তৃতা শুনলাম। স্পষ্ট সতেজ আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর। স্তালিন মলটোভ কিরোভ প্রভৃতি বলশেভিক নেতাদের সঙ্গে যে সব চেয়ার বা বাগানের বেঞ্চে বসে লেনিন পরামর্শ করতেন, সেগুলি চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। বাইরে গ্যারাজে লেনিনের ব্যবহৃত দু'খানা সে আমলের রোলস রয়েস গাড়িও রয়েছে দেখা গেল।

তরুবীথিকার অন্তরালে এক নিভৃত স্থানে বসে মনে হ'ল, এই ভবনে ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে মানব-ইতিহাসের অনন্যসাধারণ বিপ্লবী নেতা মহান লেনিন চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। শিশু সোবিয়েতের সেই মহা

দুর্দিনে— লেনিনের নামে, কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ও লেনিনের একনিষ্ঠ শিষ্য কমরেড স্তালিন শপথ গ্রহণ করেছিলেন : লেনিন-নির্দিষ্ট পথে মার্কস্‌বাদের পাষাণ কঠিন ভিত্তির উপর তিনি কৃষক-শ্রমিকের রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। এই শপথ-বাক্য বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে স্তালিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সুসম্বদ্ধ শক্তিমান সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজ সর্বহারা নিপীড়িত জনগণের মুক্তির দিশারী, ধনতন্ত্রী শোষক-শ্রেণীর দুশ্চিন্তার স্থল।

সাত

রাশিয়ার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সঙ্গে নানা উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। এক মস্কৌ সহরেই ৭।৮ খানা দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের সচিত্র ও সাধারণ সাপ্তাহিক মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা অগুনতি। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে 'প্রাবদা'র প্রচারই সর্বাধিক। লণ্ডনের 'টাইমসের' মত মস্কৌর 'প্রাবদা' আধা-সরকারী কাগজ, এতে কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারী মতের প্রাধান্য দেওয়া হয়। লেনিনগ্রাদ ও স্তালিনগ্রাদ থেকেও প্রত্যহ 'প্রাবদা' প্রকাশিত হয়। 'প্রাবদা'র পরেই 'ইজভেস্থা' ও অন্যান্য দৈনিক। প্রত্যেক দৈনিক পত্র নিজস্ব ভঙ্গীতে বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংবাদ পরিবেশন ও আলোচনা করে থাকেন। এদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। রুচিভেদে পাঠক-শ্রেণীও স্বতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাগজে চুরি-ডাকাতি আইন-আদালত ধনীদের খেয়াল ভোজসভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা নেতাদের ভাষণ ধনী সমাজের বিবাহ বা প্রণয়-ঘটিত কেলেঙ্কারী এ সব সংবাদ প্রকাশিত হয় না। বিদেশী সংবাদের মধ্যে শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন-আলোড়ন যুদ্ধ কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সংবাদ কিছু কিছু থাকে, কিন্তু প্রাধান্য পায় সোবিয়েত রাশিয়ার নিজস্ব সংবাদ। ইদানীং শান্তি আন্দোলনের

সংবাদ দৈনিকের অনেক স্থান অধিকার করছে। গঠন পুনর্গঠন শিক্ষা স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেরই বেশী প্রাধান্য। খেলাধুলা অভিনয় নৃত্য সিনেমা কলকারখানা নিয়ে আলোচনা হয়, এমন সংবাদপত্রও আছে।

এক দিন সন্ধ্যায় 'লিটারারি গেজেটে'র প্রধান সম্পাদক সিমোনভের আমন্ত্রণে আমরা তাঁর আপিসে এক সান্ধ্য বৈঠকে যোগদান করলাম। কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দৈনিক 'লিটারারি গেজেটে'র প্রচার-সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার। এতে দেশ-বিদেশের সাহিত্য সমালোচনা এবং ভাল ভাল রচনার অনুবাদকেই মুখ্য স্থান দেওয়া হয়। এ ছাড়া ঘরের ও বাইরের আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচিত হয়। রুশীয় বুদ্ধিজীবী মহলেই এর পাঠক-সংখ্যা বেশী। আলোচনা প্রসঙ্গে সিমোনভ বললেন, 'আমাদের দেশের সংবাদপত্র সম্বন্ধে বাইরের লোকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমাদের বিরুদ্ধে এই কথাটাই জোর করে বলা হয়, আমাদের সংবাদপত্র পরিচালনায় কোন স্বাধীনতা নেই। সরকারী সেন্সরের অনুমোদন ছাড়া আমরা কিছুই প্রকাশ করতে পারি না। গভর্নমেণ্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির গুণগান করাই আমাদের একমাত্র কাজ। এ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। সরকারী বিভাগীয় ভুল-ত্রুটির আমরা প্রয়োজন মত সমালোচনা করে থাকি। তিনি তাঁর কাগজের ফাইল থেকে দু'টো দৃষ্টান্ত আমাদের দেখালেন। কোন তৈল-শোধনের কারখানায় তেলের অপচয় সম্বন্ধে তথ্যসম্বলিত সমালোচনা হয়েছিল। তার জবাবে তেল বিভাগের

মন্ত্রী স্বয়ং পত্র লিখে দোষ স্বীকার করে ভুল দেখিয়ে দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে, অবিলম্বে এর প্রতিকার করা হবে।'

কমিউনিস্ট পার্টির কাজের তীব্র সমালোচনা করে লেখা একটি প্রবন্ধ তিনি পাঠ করে শোনালেন, এতে পার্টির কালচারাল ফ্রণ্টের কর্মীদের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রচারকার্যের ধারা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে। 'গ্রীষ্মের বন্ধে বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে শ্রমিক ও কৃষকদের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যাদের পাঠান হয়েছে, তাদের অপুটতার এবং এই ধরনের আরো সমালোচনা আমরা করে থাকি। সরকারী ও বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল জনকল্যাণ। ভুলভ্রান্তি সর্বত্রই আছে এবং ঘটেও থাকে, সেদিকে সজাগ থাকাই সাংবাদিকের ব্রত। এই কর্তব্য পালনে আমাদের স্বাধীনতা আছে।'

আমি রুশ ভাষা জানি না, এ সম্বন্ধে সব তথ্য জানাও কঠিন। তবে এদের সংবাদ সংগ্রহ প্রচার এবং পরিচালনার ধারা আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি তার শৈশবকাল থেকেই বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির স্তন্য পান করে সাবালক হয়েছে। এ নাড়ীর যোগ এখনো অব্যাহত আছে। আবার আয়তন ভঙ্গিমায় আমরা বিলিতী কাগজের হুবহু নকল করে চলেছি, কোন স্বকীয় ধারা সৃষ্টি করে নেবার সাহস পাই নে। মনে আছে, একবার এক বিখ্যাত ফরাসী সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাদের দেশের ইংরাজী কাগজগুলোতে বিদেশী সংবাদের এত প্রাধান্য কেন?

দেখলে মনে হয়, যেন ইংলণ্ডের কোন কাগজ পড়ছি।' উত্তরে বলেছিলাম, 'আমরা ভারতে ইংরেজ চালিত কাগজগুলোর আদর্শ অনুসরণ করি, তারা যে শ্রেণীর সংবাদকে প্রাধান্য দেয়, সেগুলোকে তেমনি ভাবে ফলাও না করতে পারলে, ইংরেজীনবীশ ভারতীয়রা দেশী কাগজ ছোঁবেও না। দ্বিতীয় কারণ, সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনে আমাদের কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান নেই। সংবাদের একচেটিয়া কারবারী 'রয়েটার'ই আমাদের একমাত্র সম্বল।' অবশ্য এখন অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।

এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেমন, সে সম্বন্ধে কিছু বল।'

উত্তরে আমাদের এক জন বললেন, 'আমাদের দেশের নয়া শাসনতন্ত্রে সংবাদপত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি। প্রেসকে সংযত রাখবার জন্য আইনও আছে। তবু আমরা সরকারী ক্রটি-বিচ্যুতির সমালোচনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়ে থাকি।' আমি বললাম, 'আমাদের দেশের অধিকাংশ বড় বড় দৈনিক কাগজ মালিকানা স্বার্থে চালিত হয়। কায়েমী স্বার্থের সমর্থক এই সব কাগজের বড় বেশী স্বাধীনতার দরকার হয় না। কেন না, এদের কোন নির্দিষ্ট মতবাদ নেই। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাতেই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সুবিধে আছে। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিক এবং নিম্নমধ্যশ্রেণীর দাবী সমর্থন করে, এমন দু'চারখানা কাগজও আছে। অন্যান্য ধনতন্ত্রী দেশের মতই আমাদের দেশে

বিভিন্ন মতবাদের সংবাদপত্র আছে। প্রেস-দমন আইন থাকলেও ইংরেজ আমলের মত কড়াকড়ি নেই।'

আলোচনা ক্রমে সাংবাদিকদের বৃত্তির নিরাপত্তা ও উপার্জনের প্রসঙ্গে এসে পৌঁছল। একজন বললেন, 'আমাদের ইউনিয়ন সাংবাদিকদের স্বার্থ ও অধিকারের সতর্ক প্রহরী। ইউনিয়নের সদস্যরা স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ করেন। বেতন ভাতা ছুটি এবং লেখার মজুরীর হার নির্দিষ্ট রয়েছে। মালিকের মুনাফার স্বার্থে কাগজ পরিচালিত হয় না বলে লাভের সমস্তটাই বাড়ি স্বাস্থ্যনিবাস শিক্ষালয় হাসপাতাল প্রভৃতির জন্য ব্যয় হয়। সাংবাদিকদের ছেলেমেয়েদের পায়োনীয়র্স ক্যাম্প বা দেশভ্রমণের ব্যবস্থাও আমরা করে থাকি। সাংবাদিকরা প্রথম দেড় হাজার রুবল মাসিক বেতনে কাজ আরম্ভ করেন। অধিকাংশের মাসিক বেতন আড়াই হাজার থেকে ছয় হাজার রুবল। বিশেষ রচনার জন্য প্রতি কলমে ১০০ রুবল দেওয়া হয়। এ ছাড়া সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি প্রবন্ধের মজুরী দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার রুবল। ত্রিশ বছর কাজ করার পর পেনসনেরও ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের এত প্রসার হচ্ছে যে, বেকার সমস্যার প্রশ্নই ওঠে না।'

দেশে ফেরার পর অনেকে আমাকে বলেছেন, ওখানে সাংবাদিকদের আর্থিক অবস্থা ভাল হতে পারে, কিন্তু তাঁদের তো একটি বিশেষ মতবাদের পোষকতা করতে হয়, স্বাধীন ভাবে

চিন্তা ও সমালোচনা করার অধিকার কতটুকু ? এ বিষয়ে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর পেয়েছেন কি ? অকপটে স্বীকার করছি, এমন প্রশ্ন আমি করিনি। কেন না পাল্টা প্রশ্ন করলে, জবাব দিতে বিব্রত হতে হত। আমার নিজের দেশে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে হ'লে কি মূল্য দিতে হয় তা আমি জানি। প্রত্যেক বৃহৎ সংবাদপত্রে তার মালিক এবং মালিকের পৃষ্ঠপোষক ধনী ও রাজনীতিক ক্ষমতাচক্রের অধিপতিদের মতামত প্রতিফলিত হয়, সম্পাদক যদি 'বিবেকে'র দোহাই দিয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করেন তবে নির্ঘাত তার অন্ন মারা যাবে এবং তার আপীল করবার মত কোন দরবার নেই। এ নিয়ে আলোচনা বাড়িয়ে পাঁক ঘুলিয়ে না তোলাই ভালো।

রাশিয়ার সাংবাদিকেরা তাঁদের বৃত্তির নিরাপত্তা ও উপার্জন এবং অপটু হয়ে পড়লে নিরাশ্রয় হয়ে অনাহারে না মরা সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিন্ত তেমন নিরাপত্তা কিছুটা ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেও আছে। সঙ্ঘবদ্ধ সাংবাদিক-সঙ্ঘ মালিকদের স্বেচ্ছাচার সংযত করেছেন, বৃত্তিগত নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের দেশের মালিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য। গত ১০।১২ বছরে এঁরা সাংবাদিকদের বৃত্তিগত নিরাপত্তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন গ্রহণ করেননি। কোন কোন কাগজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আছে, ব্যক্তিগত ভাবে কোন মালিক দয়া-দাক্ষিণ্যও দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু সেটা অনুগ্রহ মাত্র। সাংবাদিকদের তরফ থেকে গত ত্রিশ বৎসর অনেক খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত

চেষ্টা বিফল হয়েছে। সাংবাদিকদের স্বার্থ ও বৃত্তিগত মর্যাদা রক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়, শিক্ষিত শ্রেণীর বেকার সমস্যা যার সুযোগ নেবেন না, মালিকরা এত নির্বোধ নন।

এখানে দেখলাম, আমেরিকা বৃটেন অপেক্ষাও অধিক সংখ্যায় মেয়েরা সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছেন। 'টাস' 'প্রাবদা' কিম্বা অন্য কোন সংবাদ ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান থেকে যাঁরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশই নারী। আমাদের দেশ সম্বন্ধে এঁদের প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হয়েছে, ভারত সম্বন্ধে এঁরা অনেক খোঁজ-খবর রাখেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের দেশে শিক্ষিতা মেয়েরা সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করে না কেন?'

বললাম সুযোগের অভাবে। অনেক বুদ্ধিমতী মেয়ের আগ্রহ দেখেছি, কিন্তু আমাদের দেশের খবরের কাগজের আপিসের পরিবেশ নানা কারণে মেয়েদের কাজ করার অনুকূল নয়, তার ওপর একটা সামাজিক রক্ষণশীলতাও আছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা অবশ্য নানা বৃত্তিতে এগিয়ে আসছেন। আমাদের দেশে সংবাদপত্রে নিয়মিত লেখিকা অনেক আছেন; কিন্তু এখনও একজন মেয়েও পুরোপুরি বৃত্তিজীবী সাংবাদিক হন নি।

এ দেশের সংবাদপত্র আকারে আমাদের দেশের চেয়েও ছোট। চার পাতার বেশী দৈনিক কাগজ নেই। এদের কাগজে বিজ্ঞাপন নেই, কেন না ব্যবসাদারী প্রতিযোগিতা নেই। কাগজ বিক্রি করে যে আয় হয়, তাতেই ছাপাখানা ও কর্মীদের ব্যয় সঙ্কুলান করতে

হয়। কয়েকটি সংবাদপত্রের আপিসের আয়তন, আসবাবপত্র, বিশাল ছাপাখানার নানা বিভাগ দেখে আশ্চর্য হলাম। আমাদের দেশের প্রধান সংবাদপত্রের কার্যালয়গুলি তুলনায় এদের কাছে-ধারেও এগুতে পারে না।

আট

মস্কৌ-এ ট্রাম বাস ট্রলীবাস অজস্র। এগুলি সহর ও সহরতলীতে অবিশ্রাম যাতায়াত করে। ভীড় আছে, কিন্তু ঠাসাঠাসি নেই। তার কারণ, এখানে মেট্রো বা ভূগর্ভ রেলপথ রয়েছে। এতে প্রত্যহ ১৭ লাখ লোক যাতায়াত করে। এটা মস্কৌবাসীদের একটা গর্বের জিনিষ। এক দিন বেলা তিনটের সময়, আমরা হোটেলের অনতিদূরে 'রিভলিউশান স্কোয়ারে'র স্টেশনে উপস্থিত হলাম। এলিভেটারে বা এস্কোলটারে দাঁড়াতেই সর-সর করে পাতালপুরীতে নেমে গেলাম। পাতালপুরীই বটে! এর নাম রেল-ইষ্টিশান? এ যে পরীরাজ্যের রহস্যময় প্রাসাদ! মসৃণ মর্মরে বাঁধান চত্বর, পাথরের রং মিলিয়ে দেয়ালে কত কারুকার্য! ২৫ হাত চওড়া, দেড়শ' হাত লম্বা চত্বরের দু'পাশে বিপ্লবী ও গত যুদ্ধের নানা শ্রেণীর বীরদের ব্রোঞ্জ নির্মিত অতিকায় মূর্তির সমাবেশ, কি গঠন-ভঙ্গিমা, যেন সোবিয়েতের স্বদেশরক্ষার মৃত্যুপণ সঙ্কল্প আপনাতে আপনি অটল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুগ্র উজ্জ্বল আলোকে চার দিক উদ্ভাসিত, কোথাও ধূলো-ময়লা নেই। এরই দু'পাশে প্রশস্ত বারান্দা বা প্ল্যাটফর্ম, প্রতি দু'মিনিট পর পর গাড়ি আসছে-যাচ্ছে, সুশৃঙ্খল ভাবে যাত্রীরা ওঠা-নামা করছে।

যাঁরা প্যারী, লণ্ডন ও নিউইয়র্কের মেট্রো দেখেছেন, তাঁরাও এর রূপ ও সাজসজ্জার আড়ম্বর দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আমরা পর পর পাঁচটি স্টেশন দেখলাম। প্রত্যেকটির গঠনভঙ্গী রূপসজ্জা স্বতন্ত্র। বিভিন্ন রিপাবলিকের কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য উরাল পর্বতের নানা রং-এর মর্মরের সমন্বয়ে ফুঠে উঠেছে, আলোকমালাও পৃথক ধরনের। গাড়িগুলিও সুন্দর। চামড়ার পুরু গদী, নিকেলের পালিশ-করা হাতল। স্টেশনে গাড়িতে যাত্রীদের এত আরামের ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব। ১৯৩৫-এ প্রথম এর পত্তন হয়, যুদ্ধের সময়েও এর কাজ পুরোদমেই চলেছিল, এখনও চল্‌ছে, এর পরিধি প্রসারিত হচ্ছে। পৃথিবীতে এত বিরাট পরিকল্পনার ভিত্তিতে মানুষের অতুলনীয় সৃষ্টি আর কোথাও আছে বলে জানি নে।

মস্কৌ-এ আমি দু'বেলা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। মন সর্বদা উৎসুক থাকে, কিন্তু দেহ বেঁকে বসে। এক দিন দেহ কবুল জবাব দিল। সকালে একটা রুটির কারখানায় গিয়েছিলাম। পাঁচতলা উঁচুতে আটা বা ময়দা কলে মাখা হচ্ছে, আর নানা প্রকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে-ধাপে একতলার কলের মুখ থেকে নানা আকারের ও মাপের রুটি বেরিয়ে আসছে। এর প্রত্যেক তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার। প্রত্যেকবার নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, বিশুদ্ধ কি না? এখানে দৈনিক ২৮ টন রুটি তৈরী হয়। মানুষের খাদ্য সম্পর্কে কত সতর্কতা! ময়দা বা আটা গোলা থেকে তপ্ত রুটি তৈরী পর্যন্ত দেখে ও চেখে আমরা কারখানার ডিরেক্টরের ঘরে এসে

বসলাম। সাদাসিধে মানুষ, বয়স ৬৫ পার হয়েছে। ছেলেবেলায় ছোট 'বেকারী'তে মা'র সঙ্গে কাজ করতেন। বিপ্লব এলো-গেলো, 'বেকারী' ধরেই রইলেন। কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দিলেন না, এমন কি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যও হলেন না, যোগ্যতার গুণে বৃহৎ কারখানার প্রধান পরিচালক হলেন। অনেক কলকারখানা দেখেছি, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ না দিয়ে এবং শ্রমিক-সঙ্ঘে যুথবদ্ধ না হয়ে এত বড় দায়িত্ব পেয়েছেন, এমন মানুষ হয়তো সোবিয়েতে আরো আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়নি। ৭৫০ জন কারিগর এঁর অধীনে; অধিকাংশই স্ত্রীলোক। কায়িক শ্রম খুবই কম, সবই যন্ত্রে চলছে। শ্রমিকদের শিশু-পালনাগার ও কিণ্ডারগার্টেন আছে। ডিরেক্টর পুরনো দিনের অনেক গল্প বললেন, কারখানা বড় করবার সুরুতে কেতাব-পড়া বলশেভিকরা কি ভাবে কাজ ভণ্ডুল করে, শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতেই ভার দিয়েছিল, সে সব কথা কৌতুকের সঙ্গেই বললেন। সোবিয়েতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই এ কথা যারা বলে, এই ডিরেক্টর তাহার মূর্তিমান প্রতিবাদ।

রুটির কারখানা থেকে বিখ্যাত বিপ্লবী কবি মায়াকোভস্কীর বাসস্থান দেখতে গেলাম। তিন কামরার একটা ছোট ফ্লাটে তিনি থাকতেন, তার পাশের আরো দু'খানা ঘর নিয়ে একটি ছোট ম্যুজিয়ম করা হয়েছে। এর একটি ঘরে কবির কাব্য নিয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা হয়। আলমারীতে কবির রচনার বিভিন্ন ভাষার সংস্করণগুলি সাজান রয়েছে। পড়বার ব্যবস্থাও আছে। আমরা

কবির ব্যবহৃত কলম ঘড়ি খাতাপত্র শয়ন-ঘর দেখলাম। কবির মৃত্যুকালে যেমনটি যেখানে ছিল তেমনি ভাবে রাখা হয়েছে। আমরা ছাড়া আরো কয়েকটি দল এসেছে। রোজই এমনি ভীড় হয়। জাতীয় কবির প্রতি এদের খুবই অনুরাগ। ম্যুজিয়মের কর্ত্রী কবির জীবনের সব ঘটনা বর্ণনা করলেন।

হোটেলে ফিরে প্রতিনিধি দল একটা জাতীয় চিত্রশালা দেখবার জন্য চলে গেলেন। শরীর ক্লান্ত, চিত্রকলার প্রতি আমার তেমন আকর্ষণও নেই, আমি আর সঙ্গী হলাম না। মাঝে মাঝে দলছাড়া হয়ে একা থাকতে ভাল লাগে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দেখি অপরাহ্ণ ছয়টা, বাইরে রৌদ্র তখনও প্রখর, সূর্য অস্ত যাবে রাত্রি দশটায়। পথে বেরিয়ে পড়লাম, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। দক্ষিণমুখো এগিয়ে লেনিন লাইব্রেরী বাঁয়ে রেখে পশ্চিম বরাবর চলেছি। দু'পাশে দোকান, কাচের জানলায় নানা রকম জিনিষ সাজানো, ক্রেতার ভীড়ও রয়েছে। কিছু দূর এগিয়ে দেখি একটা শিশু-চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল। বাড়িটার গড়ন পুরানো ধরনের, সম্ভবত কোন ধনীর প্রাসাদ ছিল, এখন হাসপাতাল। অনেক মা ছেলেমেয়ে কোলে এগিয়ে যাচ্ছেন, কৌতূহলী হয়ে তাদের সঙ্গ নিলাম। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি দেখে এক জন মধ্যবয়সী মহিলা এগিয়ে এসে স্মিতমুখে হয়তো কিছু জিজ্ঞাসা করলেন; আমি তো এক বর্ণও বুঝলাম না, বললাম, ইণ্ডিস্কী ডেলিগাদসী। তিনি আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন, দেখি, ১০।১২ জন মহিলা ডাক্তার বসে আছেন। আমার বরাত ভাল, এর মধ্যে এক জন

ইংরেজী জানেন। তিনি খবরের কাগজে আমাদের কথা পড়েছেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, এই শিশুহাসপাতালে ৭৫০টি শয্যা আছে। ২৮০ জন ডাক্তার ও ৬০০ নার্স। এরা অবশ্য সারাক্ষণের নয়। পালা করে কাজ করেন। এ ছাড়া প্রায় ছ'শো পরিচারিকা আছে। আমি যে দেশের মানুষ, সে দেশের রাজধানী এবং বৃহত্তম নগরী কলকাতাতেও এমন হাসপাতাল নেই। পূর্বে শুনেছিলাম, এ দেশের হাসপাতালের ব্যবস্থা আমেরিকার মত ধনী দেশের মতই, আজ তা স্বচক্ষে দেখলাম। বাগানে ছেলেমেয়েদের খেলার দোলনা প্রভৃতি। একটা বড় হল্-ঘরে নানা রকম পুতুল, ছবির বই। এখানেও বসে বসে খেলার নানা সরঞ্জাম আছে। দোতলায় সুন্দর খাটে পরিপাটি শুভ্র শয্যায় শিশুরোগীরা শুয়ে আছে। শুনলাম, সমগ্র সোবিয়েতে এই রকম শিশু-হাসপাতালের সংখ্যা নয় হাজার। পাইয়োনীয়র্স ক্যাম্পে কিণ্ডারগার্টেনে এবং শিশু-পালনাগারে দেখেছি, ছোটদের মানুষ করে গড়ে তুলবার ব্যবস্থা। আর এখানে দেখলাম, রুগ্ন শিশুদের নিরাময় করে তুলবার নিরলস সেবা। কি শৃঙ্খলা কি দরদ কি কর্তব্যবোধ! সর্বত্র দেখেছি, এরা বলে, 'আমাদের ছেলে-মেয়ে', 'আমার ছেলে-মেয়ে' বলে না। এই প্রসঙ্গে জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসির একটি ঘটনা মনে পড়ছে। হোটেলের বারান্দায় বসে আছি। ফুটপাতে ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। তিন-চার বছরের একটা ছেলে 'আইসক্রীম' খেয়ে হাত-মুখ নোংরা করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, একটি সুবেশা যুবতী

দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলেন। হাত-ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে আদর করে ওর হাত-মুখ মুছিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ভাবখানা যেন এই যে, এ তো আমাদের সাধারণ কর্তব্য। এই যুবতীর নিরহঙ্কৃত কর্তব্য পালনের মধ্যে সোবিয়েত নারী-হৃদয়ের যে পরিচয় প্রকাশ পেল, তার মধ্যে দেখলাম, আত্মপরায়ণ অনুদারতার মালিন্য এদের মন থেকে মুছে গেছে।

নয়

৬ই জুলাই রাত্রি ১২টায় আমরা ট্রেনে মস্কৌ থেকে লেনিনগ্রাদ যাত্রা করলাম। সকাল ছ'টায় বিছানা ছেড়ে সোফায় বসলাম। বোতাম টিপতেই ট্রেনের 'ভ্যালেট' এসে চা দিয়ে গেল। নির্মল কাঁচের জানলা দিয়ে দেখছি, ছোট বড় গ্রাম, সবুজ ক্ষেত, পাইন বার্চ পপলারের সমুন্নত তরুশ্রেণী পাহাড়ের গা ঘেঁষে রয়েছে, কোথাও বা বিস্তৃত হ্রদ। রেল লাইনের দু'ধারে মৌসুমী ফুলের সমারোহ, রৌদ্রে উজ্জ্বল। বেলা দশটায় লেনিনগ্রাদ স্টেশনে গাড়ি থামলো, আমরা পৃথিবীর অন্যতম সেরা হোটেল আস্তোরিয়ায় এসে উঠলাম। জারের আমলে ইয়োরোপ আমেরিকার ধনীদের বিলাস ও প্রমোদ নিকেতনের বাসিন্দা বদলালেও অতীত বৈভব ম্লান হয়নি। প্রত্যেক কামরায় টেলিফোন রেডিয়ো বসবার ও শয়নগৃহ স্নানাগার ঠাণ্ডা ও গরম জল। হোটেলে ৪টা ভোজনাগার বড় বড় বৈঠকখানা মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। এমন দিন ছিল, যখন এর এক সপ্তাহের বিলাসের খরচা জোগাতে আমাদের দেশের ছোটখাট জমিদারেরা ফতুর হয়ে যেতো। এর নৃত্যশালা একদিন বহু সম্রাজ্ঞী রাণী ও অভিজাত বিলাসিনীদের কলহাস্য ও চটুল নৃত্যে মুখরিত হত। রসিক ম্যানেজার সে সব কথা শোনালেন। গত যুদ্ধের সময় জার্মানরা যখন নগরের বিশ

মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন এক দিন তিনি খোদ হিটলারের স্বাক্ষরিত এক হুকুমনামা পেলেন, অমুক তারিখ রাত্রে লেনিনগ্রাদে তিনি বিজয়োৎসব উপলক্ষে একটা ভোজসভা করবেন। পাঁচশ' অতিথির জন্য খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা রাখবে। বলা বাহুল্য এ-হুকুম তাঁকে তামিল করতে হয়নি। তিন বৎসর এই নগরী প্রায় অবরুদ্ধ ছিল। ঝটিকাক্ষুব্ধ জলধি তরঙ্গের মত বারম্বার নাৎসী বাহিনী, জনগণের প্রতিরোধের পাষাণ-প্রাচীরে নিষ্ফল মাথা কুটেছে। সহরের বিদ্যুৎ জলসরবরাহ জ্বালানী ছিল না, লোকের দু'বেলা এক টুকরো রুটিও জুটতো না, তবু জনগণ ও সৈন্যদলের মৃত্যুপণ সঙ্কল্প টলেনি। এ সব কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু এই কয়বৎসরে নাৎসী আক্রমণের ক্ষতচিহ্ন প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

পিটার দি গ্রেটের গড়া সেন্ট পিটার্সবুর্গ রূপসী নগরী। ভূমিদাসদের অস্থি-মজ্জার ভিত্তির উপর নেভানদীর দুই তীরের জলাভূমিতে এই মহানগরী আড়াই শ' বছরে গড়ে উঠেছে। রুশ সম্রাটদের প্রতাপের খর রশ্মিতে শোষিত জনসাধারণের অর্থ রাজভাণ্ডার থেকে বর্ষাধারার মত বর্ষিত হয়েছে; কত প্রাসাদ গীর্জা উপবন সে দিনের সাম্রাজ্য মহিমার স্মৃতি বহন করছে। এখান থেকেই রুশ সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীর থেকে হিমালয় হিন্দুকুশের উত্তর ভাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। স্বৈরশাসনের এই সুদৃঢ় দুর্গের ভিতের তলায়ই বিপ্লবের বারুদও সঞ্চিত হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায়।

ইয়োরোপ প্রবেশের বল্টিক সমুদ্রপথের পাহারাদার নৌ-দুর্গ

ক্রোনস্টাডের দ্বারা সুরক্ষিত লেনিনগ্রাদ সোবিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় মহানগরী। হোটেল আস্তোরিয়ার সম্মুখে বাগান দক্ষিণে বিখ্যাত গীর্জা বামে পিটার দি গ্রেটের অশ্বারূঢ় বিরাট প্রতিমূর্তি। অপরাহ্ণ ৫টায় আমরা সহর দেখতে বেরুলাম। চওড়া রাস্তা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল, খালের ওপর সাঁকো, তু'ধারে বড় বড় প্রাসাদ (এখন শ্রমিকদের বাসভবন নয় সামরিক দপ্তরখানা) স্কোয়ার বাগান দেখতে দেখতে আমরা জারদের বিখ্যাত 'উইনটার প্যালেসের' সম্মুখে এলাম। প্রাসাদের সম্মুখে পাথর দিয়ে বাঁধান প্রশস্ত চত্বর মাঝখানে গ্রানিট পাথরের বর্তুলাকার সুউচ্চ জয়স্তম্ভ। এইখানেই এক দিন সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার কুকুর কশাক অশ্বারোহী সৈন্যের কুচকাওয়াজ হয়েছে, এইখানে সমবেত প্রজাবৃন্দকে প্রাসাদের অলিন্দ থেকে স্বর্গস্থ পিতার প্রতিভূ 'লিটিল ফাদার' জার দর্শন দিয়ে ধন্য করতেন। এবং এইখানেই ১৯০৫ সালে নিরস্ত্র ক্ষুধিত জনতার আবেদনের উত্তরে জার সৈন্যরা গুলি বর্ষণ করেছিল।

এই চত্বর রাশিয়ার জালিয়ানালাবাগ। তুটি ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্চর্য মিল, সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির একই খেলা। ১৯১৯-এ বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের অসন্তোষ যখন বিদ্রোহের সীমানায়, তখন জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্র করলেন। লালা হংসরাজ নামে পুলিশের এক গুপ্তচর জালিয়ানালাবাগে এক সভা আহ্বান করলো। সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমার মেলাও ছিল। এই প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে

বেরোবার পথ রোধ করে জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র আবালবৃদ্ধবনিতার ওপর অতর্কিকে গুলী বর্ষণ করে কয়েক হাজার লোককে হতাহত করেছিল।

১৯০৫ সালে অবিকল এমনি ঘটনাই ঘটেছিল। ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গেও মিল আছে। ফরাসী বিপ্লব, রুশো ভলতেয়ারের ভাবধারায় অনুপ্রাণীত রুশ অভিজাত মহলে জাতীয়তাবাদ এবং নিয়মতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জল্পনা কল্পনা অনেক আগেই সুরু হয়েছিল, এই আন্দোলন থেকেই গুপ্তহত্যাকারী নানা বিপ্লবীদলের সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই অসন্তোষ শ্রমিক কৃষকশ্রেণীতেও দেখা দিল। রুশ জাপান যুদ্ধে জারের পরাজয় ও সামরিক শক্তির বিপর্যয়ে এই অসন্তোষ সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটে ব্যাপক হয়ে উঠলো। বিদ্রোহের আশঙ্কায় জারতন্ত্র বধ বন্ধন নির্বাসনের ভীতির রাজত্ব কায়েম করলো। কিন্তু এ-ও যথেষ্ট নয়। ছোটলোকের আস্পর্ধা অসহ্য। সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। পুলিশের বড়কর্তা এবং জারের কর্ণধার ট্রিপভ জাল পাতলো। ফাদার গাপেন নামে এক পাদ্রী ছিল পুলিশের গুপ্তচর এবং "কারখানা শ্রমিক পরিষদের" নেতা। এই গুপ্তচর গাপেন এক দরখাস্ত রচনা করে, ধর্মঘটি শ্রমিকদের বললো, চল শোভাযাত্রা করে জারের কাছে যাই। তিনি আমলাতান্ত্রিক জবরদস্তীর একটা বিহিত করবেন। দেড় লাখ শ্রমিক তার অনুগামী হ'ল। আবেদনপত্রের ভাষা দেখলেই বোঝা যায়, এ কোন বিপ্লবীর

রচনা নয়। ক্ষুধিত সর্বরিক্ত শ্রমিকদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার চতুর পুলিশ গুপ্তচরের ছলনা।

"সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক আমরা আপনার দুয়ারে এসেছি, আমরা দুর্ভাগা, বহু নিন্দিত ক্রীতদাস। স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারে আমরা ভেঙ্গে পড়েছি। আমরা কাজ বন্ধ করেছি, কিন্তু মালিকদের কাছে আমাদের এই ভিক্ষে, যতটুকু না হ'লে ছেলেপুলে নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না, তার বেশী আমরা চাইনে। কিন্তু এই বাঁচবার দাবীও মালিকরা মানলো না, আমরা যেন মানুষ নই, আপনার কর্মচারীরাও আমাদের দাস করে রাখবার মালিকদের জেদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রভো, আপনার নিরুপায় নির্যাতীত প্রজাদের আপনি সাহায্য করুন। আপনার প্রজাদের আবেদন মঞ্জুর করুন। যদি আপনার দয়া না হয়, তা'হলে এইখানেই মরা ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।"

'দয়ালু লিটিল ফাদার' জার দর্শন দিলেন না। কিন্তু তাদের প্রার্থনার দ্বিতীয় আবেদন মঞ্জুর করলেন। প্রাসাদের বুরুজ থেকে শিলাবৃষ্টির মত রাইফেলের গুলী বর্ষিত হ'ল। মরণাহতের আর্তনাদ মুখরিত চত্বরে অশ্বারোহী কশাকবাহিনী হিংসা ও হত্যার মহোৎসবে মেতে বইয়ে দিল রক্তগঙ্গা। পরদিন পুলিশ-রিপোর্টে প্রকাশিত হ'ল, এক হাজার নিহত ও দু'হাজার আহত হয়েছে। বেসরকারী হিসেবে হতাহতের সংখ্যা ছ' হাজারের ওপর! রুটি বা জীবিকার বদলে বুলেট। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী 'রক্তাক্ত রবিবার' রূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এত বড় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে সেদিনের ইয়োরোপের কূটনীতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি। কেবল পারীর প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ফ্রান্সের নানা স্থানে সভা করে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯০৫-এর ৩০শে জানুয়ারী পারীর এক জনসভায় বিখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী আনাতোল ফ্রাঁসের বজ্রস্বর মন্দ্রিত হ'ল; "জার ক্ষুধিত নরনারীকে হত্যা করেছে, তারা চেয়েছিল খাদ্য, পেয়েছে বুলেট, জার জারকেই হত্যা করেছে। যে সব নির্দোষীর রক্তে নেভা নদীর জল রাঙ্গা হ'ল, তার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্মাবে, যারা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবে। জার যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালালেন, তা তারই চিতাশয্যা। নিকোলাস আলেকজেণ্ডারের দিন ফুরিয়েছে, ইতিহাসে তার কলঙ্কিত স্মৃতিমাত্র থাকবে। জার গভর্নমেণ্ট শ্রমিকদের হত্যা করেছে, শিক্ষিত যুবকদের জেলে পুরছে, সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠাচ্ছে। আমি দেখছি, যে বিপ্লব বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল, তা থামবে না। আমার একমাত্র শঙ্কা, এই রক্তাক্ত পথ যেন দীর্ঘ না হয়। এ দৃশ্য ভয়াল অথচ গরিমাময়। ছাত্র অধ্যাপক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, মরণ অভিসারে। একটা পীড়িত জাতির মর্মমথিত ক্রন্দন বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার থেকে উঠে, আকাশে প্রতিধ্বনি তুলছে। জারের নৃশংস পাশবিকতা, আজ রুশজাতির সত্যানুরাগ ও সততার সম্মুখীন। অত্যাচারই অত্যাচারীকে গ্রাস করবে, সে দিনের বেশী বিলম্ব নেই।"

আনাতোল ফ্রাঁস রাশিয়ার সর্বহারা (প্রোলেটারিয়েট) দের যে বিজয় কামনা করেছিলেন, তা লেনিন-স্তালিন চালিত বলশেভিক পার্টি মাত্র বার বছরের মধ্যেই সফল করেছিল। সেই শুভদিন দেখবার পূর্বেই আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বশান্তির পুরোধা আনাতোল ফ্রাঁস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

এখান থেকে বিখ্যাত কবি পুসকিনের আবাস, সম্প্রতি ম্যুজিয়ম। গত শতাব্দীর স্বচ্ছল মধ্যশ্রেণীর অভিজাতদের বাড়ী ঘর আসবাব-পত্রের স্মৃতি। পুসকিনের ছবি, লেখার পাণ্ডুলিপি, বইএর বিভিন্ন সংস্করণ, তাঁর লাইব্রেরী, নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্র সাজান রয়েছে। সেকালের প্রথায় শত্রুর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে পুসকিন গুরুতর আহত হয়ে মারা যান, তাঁর শেষ শয্যা দেখলাম। সোবিয়েত রাশিয়ায় পুসকিন সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। নূতন রাজাধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গ নিয়ে একটি কবিতায় তিনি লিখে-ছিলেন, "নব বধুর রূপ যৌবন অলঙ্কারে ভূষিতা তুমি, তোমার জৌলুসে প্রৌঢ়া শাশুড়ীর মত মস্কৌ পরিম্লান।"

নেভা নদীর ধার দিয়ে চলেছি, স্রোত মন্থর, গাঢ় নীল জল। মোটর বোট ও স্টীমার চলেছে, তুই তীরে কারখানা, বাসগৃহ। এখানে এক বাগানে নেভা নদীর দিকে মুখ করে, অশ্বারোহী পিটার দি গ্রেটের বৃহৎ মূর্তি, পায়ের তলায় একটা সাপ বা ড্রাগনকে বর্শায় বিদ্ধ করছেন। মূর্তিটির বীরত্ব ব্যঞ্জক ভঙ্গী শিল্পী জীবন্ত করে তুলেছেন। সমস্ত সহরে আর কোন জারের মূর্তি নেই। জার নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করার পর কেরেনেস্কী

গভর্নমেণ্টের আমলে প্রাক্-বলশেভিক বিপ্লবীরা সেগুলি ধ্বংস করে ফেলেছিল।

ক্রমে অগ্রসর হয়ে আমরা জারের দুর্গে প্রবেশ করলাম। বড় বড় দু'তিনটি গীর্জা। একটি গীর্জার প্রাঙ্গণে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্মরে জার ও জারিনাদের সমাধি, দেয়ালের গায়ে বাইবেলের কাহিনীর চিত্র। এগুলিতে এখন আর প্রার্থনা করবার জন্য নর-নারীর ভীড় হয় না, কৌতূহলী জনতা ম্যুজিয়ম দেখতে আসে। দুর্গের মধ্যে প্রাচীন কারাগার। এর সেলগুলি এক একটি ভয়াবহ অন্ধকূপ, বারান্দায় পাহারারত প্রহরীর জুতোর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যেতো না। কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলের ৪০ ডিগ্রীর সেলগুলি এর তুলনায় আরামপ্রদ। এক একটি সেল যেন সাম্রাজ্যনীতির প্রতিহিংসার নিষ্প্রাণ নিষ্ঠুরতা। এখানে কত বিপ্লবী পাগল হয়েছে, কত আত্মহত্যা করেছে; কত প্রতিভা-শালী যুবকের সুগঠিত দেহ জরায় জীর্ণ হয়ে গেছে এই নিরানন্দ পুরীতে। লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১৯ বছরের যুবক উলিয়ানভ ফাঁসির পূর্বে যে সেলটিতে ছিলেন সেটি এবং গর্কী ও অন্যান্য প্রাক বলশেভিক বিপ্লবীদের সেলগুলি চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। ১৯০৪-৬ সালের বিদ্রোহের সময় এই জেলখানায় অতি বীভৎস নারকীয় অত্যাচার হয়েছে, তার কতকগুলি মরচে ধরা পীড়ন যন্ত্র দেখলাম। মন বিষাদে ভরে উঠলো। মনে পড়লো, আমাদের দেশের ইলিসিয়াম রোর (অধুনা লর্ড সিংহ রোড) গোয়েন্দা ঘাঁটির কথা। পীড়ন করে পেটের কথা বার করবার ওস্তাদিতে

এরাও ছিল রুশ-পুলিশের সাঙ্গাৎ। যৌবনে আমি এবং আমার বন্ধুরা অনেকেই গোয়েন্দা পুলিশের মোলায়েম ব্যবহারের স্বাদ পেয়েছেন। তফাৎ এই, সোবিয়েত গভর্নমেণ্ট তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে, আর আমাদের গভর্নমেণ্ট সেই সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের প্রমোশন দিয়ে পুলিশ-বিভাগের চূড়োয় বসিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখেই বলেছিলেন, "যে লোক স্বার্থপর বেইমান, যে উদাসীন নিশ্চেষ্ট, বর্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থায় তারই জীবনযাত্রা সব চেয়ে নিরাপদ তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প।"

৮ই জুলাই রবিবার। মেঘলা প্রভাত। বৃষ্টি মাথায় করে আমরা 'স্মোলনী ইনস্টিটিউটে' গেলাম। পূর্বে অভিজাত মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয় ছিল। ১৯১৭র বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে বলশেভিকদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এই সদর দপ্তরখানা থেকে লেনিন ও স্তালিন বিদ্রোহী সৈন্যদের সংহত ও শৃঙ্খলিত করে, ৭ই নভেম্বর প্রায় বিনা রক্তপাতে পেট্রোগ্রাদ দখল করেন। ৭ই নভেম্বর রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটে, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সোবিয়েত সোস্যালিস্ট গভর্নমেণ্ট আবির্ভূত হয়েছিল।

প্রকাণ্ড বাড়ী, অধিকাংশই এখন সামরিক দপ্তরখানা, চারদিকে কড়া পাহারা। দোতালার কতকগুলো ঘর ম্যুজিয়ম, লেনিনের ছোট্ট শয়ন কক্ষ, সাধারণ খাট বিছানা বসবার চেয়ার। যে ঘরে সামরিক বৈঠক বসতো, তাতে অনেক ঐতিহাসিক দলিল ও ছবি আছে। এখানেই প্রথম বলশেভিক কংগ্রেসে লেনিন

বিপ্লবী সেনাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ৪৭ বৎসর বয়সের লেনিনের তৈলচিত্র, সুগঠিত দেহ উজ্জ্বল মর্মভেদী দৃষ্টিতে তেজস্বী জীবনের বহ্নিজ্বালা, কক্ষগাত্রে বিলম্বিত।

বলশেভিক বিপ্লবের ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে করতে আমরা নগর ছাড়িয়ে অগ্রসর হলাম। মেঘের ঘোমটা সরিয়ে সূর্য প্রকাশ পেয়েছে, সদ্যস্নাত গাছের পাতাগুলি চিকচিক করছে, প্রশস্ত পথের দু'ধারে অজস্র রঙ্গীন ফুল ফুটে রয়েছে, মাঠের মধ্যে নূতন বাড়ী, তার পাশেই জার্মান আক্রমণে বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত বাড়ীও রয়েছে। ক্রমে আমরা পুসকিন গ্রামে প্রবেশ করলাম। এটা জার্মানরা দখল করেছিল, দু'পক্ষের গোলাগুলী বর্ষণে অধিকাংশ বাড়ীই জখম হয়েছিল। আবার এরা আরো সুন্দর করে বাড়ী বাগান পথ গড়ে তুলেছে। এখানকার এক বিশাল জারীয় প্রাসাদে জার্মান সৈন্যরা থাক্‌তো, পালাবার সময় ইচ্ছে করে এর ক্ষতি করে গেছে, শিল্পকলার নিদর্শনগুলি কতক লুট করেছে, কতক নষ্ট করে গেছে। বাড়ীটা খাড়া আছে, তাই ধীরে ধীরে মেরামত হচ্ছে। এর একটা অংশ মেরামত করে পুসকিন ম্যুজিয়ম হয়েছে। বহু চিত্র ও পুরনো শিল্পের নিদর্শনের সংগ্রহ। এখানে নবীন রাশিয়ার অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, নবসৃষ্টির আনন্দে বিকশিত হচ্ছে নগর নির্মাণের সুষ্ঠু পরিকল্পনায়।

আমরা যখন সহরে ফিরে এলাম, তখন সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এসেছে, নেভা নদীর গাঢ় নীল জলে রক্তিম আলো কাঁপছে।

নদীতীরে নোঙ্গর করা ক্রুজার অরোরা বা আবরোরা। এই রণতরীর নৌ-সৈন্যরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেয়, এবং 'উইনটার প্যালেসে'র সম্মুখে তাদের কামান-শ্রেণী উদ্যত করে। অরোরার কামানশ্রেণীর গর্জনে কেরেনেস্কী পন্থীরা পালিয়ে যায়। সেই নৌ-বিদ্রোহীদের মধ্যে জীবিত এক জন প্রৌঢ় এখন এর অধ্যক্ষ, ইনি আমাদের সবদিক ঘুরিয়ে দেখালেন এবং সেদিনের গল্প শোনালেন। এটি ১৯০০ সালে তৈরী হয়, ৬৫০০ টন, দু'পাশে ও সম্মুখে অনেকগুলি কামান। এখন এটিতে শিক্ষার্থী নৌ-সৈন্যরা থাকে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিত্রশালা, শিশুপ্রাসাদ, শিক্ষাগার, সংস্কৃতিভবন দেখি, তারপর থিয়েটার, বালে নৃত্য, 'পাপেট থিয়েটার'। গ্রীষ্মকালে এখানে দিনরাতের ব্যবধান নেই, এখানে রাত্রি শুভ্র রৌদ্রময়ী। পাপেট বা পুতুলের থিয়েটার আমার চোখে এক অভিনব ব্যাপার। কৌতুককর একটা মিলনান্তক প্রেম কাহিনী, পুতুলেরা মানুষের মত কথা বলছে, অভিনয় করছে, জীবনে এমনটি কখনো দেখিনি।

বিখ্যাত উইনটার প্যালেসে প্রবেশ করলাম। বিপুলতায় বিশালতায় ভাস্কর্যে স্থাপত্যে চিত্রাঙ্কনে এর জুড়ি পৃথিবীতে আছে কিনা জানিনে। ফরাসী সম্রাটদের ভার্সাই প্রাসাদের রূপের খ্যাতি আছে, কিন্তু দুইএর প্রকৃতি ভিন্ন। এর রূপ পুষ্পপেলব কমনীয় নয়, ঐশ্বর্য ও প্রতাপের উগ্রতায় প্রদীপ্ত। ফরাসী ইতালীয় ডেনিস জার্মান শিল্পীদের তিন শতাব্দীর সৌন্দর্য সৃষ্টি

এই প্রাসাদের প্রতি কক্ষে অলিন্দে চত্বরে স্থির বিদ্যুতের মত অচপল হয়ে আছে।

এই প্রাসাদের অধিকাংশ অর্থাৎ ৩৪০টি কক্ষ ম্যুজিয়ম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিত্র, পুরাতন মূর্তি অস্ত্রশস্ত্র বসন-ভূষণাদিতে সুসজ্জিত এই 'যাদুঘর' এখন আর্মিটাস বা হার্মিটেজ নামে পরিচিত। মোটামুটি দেখতে গেলেও ৫।৭ দিন সময় লাগে। ৩।৪ ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম, গ্রীক ও রোমক ভাস্কর্যের নিদর্শনের প্রচুর সংগ্রহ দেখে বিস্মিত হলাম।

লেনিনগ্রাদের লোকসাধারণের জীবনযাত্রা দোকান পশার কারখানা হাসপাতাল মস্কোর মতই, মস্কোর মতই সহর প্রসারিত হচ্ছে, নূতন নূতন আবাসগৃহ তৈরী হচ্ছে। ১০ই জুলাই অপরাহ্নে স্থানীয় লেখক ও সাংবাদিক সঙ্ঘের বিদায় সম্বর্ধনার পর রাত্রের ট্রেনে আমরা লেনিনগ্রাদ ত্যাগ করলাম।

দশ

মস্কৌএ ফিরে অপরাহ্নে আমরা ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা করলাম। মস্কৌএর পণ্ডিত মহলে এঁর বিশেষ সমাদর। সোভিয়েতের মন্ত্রী ও কূটনীতিবিদ্‌রাও তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। এই মেলামেশায় তিনি খোলাখুলি ভাবে যে সব আলোচনা করেন, তার কিছু কিছু গল্প বল্‌লেন। আমাদের এখানের অভিজ্ঞতা শুনে তিনি বল্‌তে লাগলেন, এদের শান্তি আন্দোলনটা লোক দেখান ব্যাপার নয়, সত্যিই এরা শান্তি চায়। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম এরা দেখেছে। দেখলে তো কি ভাবে এরা পুনর্গঠনে হাত দিয়েছে। এদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর সমাজ-জীবন নির্ভরশীল। তাই অর্থনৈতিক উন্নতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রূপও বদলাচ্ছে, লোক ব্যবহারে কোথাও অতিনির্দিষ্টতা নেই। এরা ভুল স্বীকার করে এবং সংশোধন করে নেয়। এদের সমাজের এই সচলতা বিদেশীর দৃষ্টিতে সহসা ধরা পড়ে না।

এদেশের মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ও অসঙ্কোচ আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা উঠ্‌তেই রাধাকৃষ্ণণ বলে উঠ্‌লেন, শিক্ষা বিস্তার আর মেয়েদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়াতেই এটি সম্ভবপর হয়েছে। তোমরা লক্ষ্য করেছ, এরা প্রগলভা নয়, এদের

হাবভাব সাজসজ্জা সংযত। আধুনিক রাশিয়ান তরুণীদের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

কেবল তরুণীরা নয়, হাল আমলের তরুণরাও যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ইস্পাত হয়ে উঠেছে। এদের সমাজ চেতনা, পরস্পরের প্রতি সুবিবেচনা এদের চরিত্রের বনিয়াদ। আমি এক দিন লেনিন মুাজিয়মে দোতালার সিঁড়ি বেয়ে উঠ্ছি কয়েক ঘণ্টা ঘুরে ক্লান্ত হয়েছিলাম নিশ্চয়। হয় তো তাই দেখে দুটি মেয়ে আমার দু'পাশে এসে আমার দুই বাহু ধরে উঠ্তে সাহায্য করলো। সঙ্কোচের সঙ্গে বল্‌লাম, "নিয়েৎ নিয়েৎ" অর্থাৎ প্রয়োজন নেই। আমার দোভাষীকে দিয়ে বলালাম, আমার বয়স হয়েছে, তবে এত বুড়ো হইনি যে সাহায্যের প্রয়োজন আছে। ওরা শুনে হাসতে লাগলো, কিন্তু ছাড়ল না। পরে আমি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি বিদেশী বলেই বুঝি এতখানি সৌজন্য দেখালো। সে বললে, মোটেই নয় আমরা ছেলেবেলা থেকেই বুড়োবুড়ীদের সম্মান করতে শিক্ষা পেয়েছি। বয়স্কদের অবজ্ঞা করা বা তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা অভদ্রতা। আমি এই ঘটনার পর থেকে লক্ষ্য করেছি, ট্রাম বাস বা দোকানের 'কিউ'এ এরা প্রাচীনদের অগ্রাধিকার দেয়। ট্রামে বাসে বুড়োবুড়ীদের বসবার আসন ছেড়ে দেয়। আর এক দিনের কথা মনে আছে, সাংস্কৃতিক উদ্যানে উক্রেন কুটির-শিল্পের প্রদর্শনী দেখে, ধূমপানের জন্য বাগানের একটা বেঞ্চে বসেছি, আমার সামনের বেঞ্চে একজন যুবক ধূমপান করছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধ এসে পাশে বস্‌তেই

সে সিগারেট্টা ফেলে দিল। যুবকটি যখন উঠে যাচ্ছে, তখন ইঙ্গিত করতেই আমার সম্মুখে এসে সলজ্জভাবে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি সিগারেট্টা ফেলে দিলে কেন?'

'ওঁর অসুবিধা হতে পারে।'

'জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।'

'তা হলে কি আর উনি বলতেন। অনর্থক ওঁকে পীড়া দিতাম, তাই ফেলে দিলাম।'

বুঝলাম এদের শ্রদ্ধাটা কত স্বাভাবিক। এটাও লক্ষ্য করেছি, বুড়োবুড়ীদের এরা শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োগ করে না। আপিস কারখানা রেল স্টেশন বিমান ঘাঁটিতে দেখেছি, দরজায় পাহারা বা বিশ্রামাগারের তদারক বয়স্করাই করে। হোটেলের ছোট ছোট কাজে এরাই রয়েছে। অথচ এই দেশের বিরুদ্ধে এমন কথা রটনা করা হয় যে, এ দেশের নরনারীকে দিয়ে ক্রীতদাসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়ে নেয়া হয়।

মস্কোএ একটা "হাউস অফ্ রেস্ট" বা বানপ্রস্থীদের বিশ্রামাগার দেখতে গিয়েছিলাম। ৩০০ লোক থাকবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাসিন্দা মাত্র ৫০।৬০ জন। অধ্যক্ষ বললেন, পেনসান পাওয়ার পর মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের সংসারেই বেশীর ভাগ রয়ে যায়। যাদের কেউ নেই তারাই এখানে আসে। এরাও অলস ভাবে বসে থাকে না, সাধ্য মত ছোটখাট কাজ করে। পড়াশোনা ও দাবা খেলা নিয়ে সময় কাটায় এমন লোকও অবশ্য আছে। বাপ-মা নিয়ে পারিবারিক জীবনটা অবশ্য ইয়োরোপীয় সমাজ-

সম্মত নয়, হয় তো এদের সামাজিক অর্থনীতির ফলে এটা সম্ভব হয়। বিবাহিত ভাইবোনেরা একত্র থাকে এও দেখেছি, এমন কি আমাদের দেশে উপহাসভাজন ঘরজামাইও দেখেছি। তবে এরা শ্বশুরাশ্রিত জীব নয়, রোজগার করে।

প্রবীন বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্মান আমাদের দেশেও ছিল, পল্লীতে এখনও কিছুটা আছে। কিন্তু কলকাতা সহরের যুদ্ধোত্তর নাগরিক সভ্যতায় ওর আর কোন চিহ্ন নেই। পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে, ট্রেনে বিপণীতে পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনের রেওয়াজই উঠে গেছে। আমাদের সহরে ট্রামে বাসে দুর্বল দেহ বৃদ্ধকে বসবার আসন কেউ ছেড়ে দেয় না, সামান্য আরাম ছেড়ে ভদ্রতার বিলাস এখানে অচল।

যে দেশে পরশ্রমজীবীর দল একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে, যেখানে সমাজের লোক-সাধারণকে খাটিয়ে মুনাফার পাহাড় তৈরী করে সঞ্চিত ধন ব্যক্তিগত ভোগে অথবা অধিকতর মুনাফা সংগ্রহে প্রয়োগ করার সুযোগ নেই, সেখানে মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন অনিবার্য। এই পরিবর্তন এসেছে সর্বমানবের সমান অধিকার বোধ থেকে। এক নয়া অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর এদেশের সমাজ-জীবন দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাবীকালে কি রূপ নেবে, তা' আজ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে সর্বসাধারণের সম্মুখে শিক্ষার দ্বার এরা যে ভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তাতে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও উৎকর্ষ অনিবার্য। বঞ্চক ও বঞ্চিত, শোষক ও শোষিত, সুবিধাভোগী ও অধিকার বঞ্চিতের লোভ ও ক্ষোভের

সংঘাতে যে শ্রেণীবিদ্বেষ নানা আকারে সমাজদেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সে স্তর পার হতে এদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, ব্যক্তিগত মতস্বাতন্ত্র্যকে সমষ্টির কল্যাণে সংযত করতে হয়েছে। কিন্তু আজকের সমাজের চেহারাটা দেখলে বোঝা যায় যে, লেনিন-স্তালিনপন্থীরা ওপর থেকে জনগণের ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়নি, সমাজের সমগ্র মনকে তারা উদ্বুদ্ধ করেছে, দেশের সৌভাগ্য-সৃষ্টির কাজে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকলে নূতন সমাজ গড়া যায় না। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ রুশ জনসাধারণের আত্মনির্ভর বিশ্বাস, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিয়েছে বলেই জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই আত্মীয় হয়ে উঠেছে। লোক ব্যবহারে বৈষম্য নেই।

এগার

১২ই জুলাই প্রভাত ৭টায় মস্কৌ বিমান ঘাঁটি থেকে স্তালিনগ্রাদ যাত্রা করা গেল। বেলা ৯টার সময় ভরোনেৎসে বিমান থামল। আমরা চা-পান করতে করতে বিমান ঘাঁটির ভোজনাগারের দোতালার জানালা দিয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নগর দেখলাম, বহু শুভ্র সম্মুন্নত বাড়ী আবার আকাশে মাথা তুলেছে।

বিমান নিচু দিয়ে চলেছে, ডন নদীর দু'পাশে সমবায় কৃষিক্ষেত্রের বিশাল বিস্তার, অরণ্যখণ্ড, স্তেপভূমি ও ছোট বড় গ্রাম। দেখতে দেখতে বেলা সাড়ে এগারটায় স্তালিনগ্রাদে অবতরণ করা গেল। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। মোটরে সহরের দিকে অগ্রসর হলাম, দুইদিকে ধ্বংসস্তূপ কাঁটা-তারের বেড়া, পরিত্যক্ত পরিখার খাদ, তারই মধ্যে নূতন জনপদ গড়ে উঠছে। পথের দু'ধারে সহরতলীর চেহারা সুশ্রী নয়। ক্রমে প্রশস্ত মসৃণ পথে নগরীর কেন্দ্রস্থলে এসে পড়লাম। একটা মাঝারী গোছের হোটেলে আস্তানা পেলাম। বাঙ্গলা দেশের মত গরম। ফিরিঙ্গী পোষাক ছেড়ে, স্নান করে ধুতি পাঞ্জাবী পরে বাঁচি। লেনিনগ্রাদ থেকে স্তালিনগ্রাদ, এ যেন দারজিলিং থেকে গ্রীষ্মকালের কলকাতা।

হোটেলের জানালা দিয়ে দেখছি, দূরে ভল্গা নদী, সম্মুখে প্রকাণ্ড

একটা ছ'তালা বাড়ী, সমবায় সমিতির বিপণী। দূরে দূরে বড় বড় বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ, আর তার পাশেই উঠ্‌ছে নূতন সৌধ-মালা। মহাসর্বনাশের বুকে নবসৃষ্টি রূপায়িত হয়ে উঠ্‌ছে। প্রলয় ও সৃষ্টির মহারহস্য রৌদ্রতপ্ত নগরীর বুকে এক বিভ্রান্তিকর মরিচীকার মত মনে হ'ল। প্রণাম করে বললাম, স্তালিনগ্রাদ তুমি আজ মস্কৌ বা লেনিনগ্রাদের মত রূপসী নও, তুমি বীর্যবতী। নাৎসী-দানব দলনে তোমার ভীমা ভৈরবী মূর্তি আজ সংযত। লক্ষ নরমুণ্ডের ওপর তুমি কমলামূর্তিতে নবসৃষ্টির সাধনায় বসেছ মহিয়সী রাণীর মত।

১৯১৮ সালের কথা। জারের আমলে জারিৎসিন নামে খ্যাত নগরী, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী সেনাপতিদের দ্বারা অবরুদ্ধ। অবস্থা সঙ্গীন। লাল পল্টনের ব্যূহ বিচ্ছিন্ন। উত্তর ককেশিয়া থেকে মস্কৌএ গম পাঠাবার পথ প্রতিবিপ্লবী কশাক সৈন্য অধিকার করেছে, এমন সঙ্কটের দিনে লেনিনের নির্দেশে স্তালিন জারিৎসিন অবরোধ মুক্ত করবার ভার গ্রহণ করলেন। রাজনীতিক বিপ্লবী নেতা স্তালিন সামরিক নেতৃত্বেও তাঁর প্রতিভা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিলেন। জারিৎসিন বন্দর অবরোধ মুক্ত হল ; তাঁর উৎসাহে অনুপ্রাণিত লালপল্টন জেনারেল ক্রাসনফের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এই বিপুল সাফল্যের স্মৃতিরক্ষায় সোবিয়েত গভর্নমেণ্ট বন্দরের নূতন নাম দিলেন স্তালিনগ্রাদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী বাহিনী পরিবেষ্টিত স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের ইতিহাস অনেকেরই জানা। ১৯৪১এর সেপ্টেম্বর মাসে

হিটলারের ঝটিকাবাহিনী শহরে প্রবেশ করেছে, নির্মম নিষ্ঠুর সংগ্রাম। ৩০শে সেপ্টেম্বর হিটলার ঘোষণা করলেন, "আমাদের জয় সম্পূর্ণ হয়ে এল। আমরা স্তালিনগ্রাদ আক্রমণ করেছি, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, স্তালিনগ্রাদ আমরা দখল করবোই।" পৃথিবীর ইতিহাসে এমন যুদ্ধ হয় নি। ধ্বংসের মহাশ্মশানে পরিণত নগরীর প্রতি গৃহে প্রতি পথে আধুনিক মারণাস্ত্রের সংঘাত, চারদিকে ভগ্ন কামান বিমান শেলের আবরণী, রাইফেল এবং অগণিত মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। জয়াশাহীন জার্মানরা হত্যা ও ধ্বংসের উৎসবে মেতেছে, এমন সময় ৮ই জানুয়ারী সোবিয়েত সেনাপতি চরমপত্র দিলেন, তোমাদের জয় বা পলায়নের কোন ভরসা নেই, অনর্থক রক্তপাত থেকে নিবৃত্ত হয়ে আত্মসমর্পণ কর। এই উদার প্রস্তাব জার্মান সেনাপতি অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ আহত সিংহের মত লালপল্টনের আক্রমণের সম্মুখে নাৎসী বাহিনী দাঁড়াতে পারলো না। সাত মাস অবরোধের পর ৬০ ডিভিসন শত্রু সৈন্যকে উৎসাদিত করে মার্শাল জুকভ স্তালিনগ্রাদ অধিকার করলেন। এবং মার্শাল ফন পাউলুস ২৪ জন জেনারেল, ২৫০০ অফিসার এবং ২০ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করলেন। ১৯৪৩এর ৫ই ফেব্রুয়ারী বিধ্বস্ত মহানগরী স্তালিনগ্রাদে নাৎসী বিজয় অভিযানের সমাধি রচিত হ'ল।

জারিৎসিন ও স্তালিনগ্রাদের দুই-দুইবার অকুতোভয় শৌর্যে শত্রু পরাভবের নিদর্শনগুলি একটি ম্যুজিয়মে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া কামান বন্দুক তরবারী, লেনিনের

লেখা চিঠি, স্তালিনের উত্তর, অনেক দলিল, ছবি দেখতে দেখতে আমরা একটি কক্ষে উপস্থিত হলাম। এখানে নাৎসী বিজয়ী স্তালিনগ্রাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব অভিনন্দন ও উপহার পেয়েছে তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বৃটিশরাজ ষষ্ঠ জর্জের তরবারী রুজভেল্টের স্বর্ণখচিত অভিনন্দনপত্র। নাৎসী দাসত্বের নিগড় থেকে শুধু নিজেদের নয়, পৃথিবীকে মুক্ত করলো যারা, তারা দেশ দেশান্তর থেকে কত উপহার কত অভিনন্দন পেয়েছে। আমার মাতৃভূমি ভারত কোথায়? দেখলাম ভারতের উপহার একমাত্র ছাত্র ফেডারেশানের দিল্লী শাখা থেকে দেওয়া একখানি বেনারসী শাড়ী ও নেকলেস। আমার ভাগ্য ভাল, বাঙ্গলা ছাত্র ফেডারেশানের উপহার নয়। আমরা শাড়ী, চুড়ী বা হার কাপুরুষদেরই বিদ্রুপ করবার জন্য উপহার দিয়ে থাকি।

ম্যুজিয়ম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সম্মুখে শহীদ চত্বর। পূবদিকে মাইল তিনেক দীর্ঘ 'শান্তি সড়ক', দু'পাশে ৫।৭ তলা বাড়ী, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের আবাস ভবন। চত্বরের পশ্চিমে বিশাল নাট্যশালা গড়ে উঠছে, উত্তরে বাগান। আমরা চলেছি, ভল্গা নদীর দিকে। রাস্তার দু'পাশে যেমন নূতন ইমারত, তেমনি ভাঙ্গা বাড়ীগুলোও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। প্রতিদিন চারদিক ঘুরে দেখেছি, প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা। এক একটা বাড়ী বহুভাবে বিদীর্ণ হয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবের কঙ্কালের মত পড়ে আছে; আবার ৫।৭ তলা বাড়ী ঠিক খাড়া আছে কিন্তু সর্বাঙ্গে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। এ বাড়ীগুলির উপর বোমা পড়েনি। এর

প্রত্যেক তলায়, প্রত্যেক কক্ষে, সিড়িতে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়েছে।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পথে স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে চলেছে নদীর ধারে। ধূতিচাদর পরা বাঙ্গালী আমি কৌতূহল নিয়ে চলেছি। এই ভল্গা নদী! সহরের পূর্বপার ঢালু হয়ে নেমে গেছে, পশ্চিম পার খাড়া উঁচু। স্রোত মন্থর। কাস্পিয়ান সাগর সঙ্গম বেশী দূরে নয়। ভল্গার তীরে দাঁড়িয়ে প্রথমেই মনে হ'ল একখণ্ড পূর্ববঙ্গ যেন রাশিয়ায় ছিটকে এসে পড়েছে। এ নারায়নগঞ্জ না চাঁদপুর? সেই স্টীমার ঘাট, গাধাবোট টেনে চলেছে ছোট্ট স্টীমলঞ্চ, যাত্রী-বাহী স্টীমার নোঙ্গর করে আছে ঘাঠে, পালতোলা নৌকো চলেছে বুক ফুলিয়ে, গাঙচিলের দল আকাশে পাখা মেলে উড়ছে। আমার দেশ আমার জন্মভূমির স্মৃতি বড় বেশী করে মনে পড়তে লাগল, উন্মনা হয়ে গেলাম। পদ্মা যমুনা ধলেশ্বরী মেঘনা কোথায়, আর কোথায় ভল্গা! ওপারের তরুশ্রেণী-ঢাকা গ্রামের নিস্তব্ধ নিকেতনে সারাদিনের কর্মশ্রান্ত মানুষ আমার দেশের মতই স্নেহ মমতা ভালবাসার একান্ত নির্ভরপর শান্তির নীড়ে ফিরে চলেছে; কল্পনা-নেত্রে যেন প্রত্যক্ষ করলাম। অনেকদিন আগের কথা, এমনিভাবে একদিন মালাবারে পূর্ববঙ্গের শ্যামলশ্রী মনকে অভিভূত করেছিল। স্তালিনগ্রাদ তুমি কেবল বীর্যবতী নও, তুমি রূপসীও। পূর্ববঙ্গের সজল কোমল শ্যামলশ্রী, অস্তরবির রক্তিম আলোয় কি অপরূপ হয়ে দিগ্‌বলয় পর্যন্ত উদ্ভাসিত।

বার

স্তালিনগ্রাদে তুটো কারখানা দেখলাম। একটি "রেড অক্টোবর ফ্যাক্টরী" ইস্পাতের কারখানা; আর একটি "ঝেরঝিনস্কী ট্রাকটর ফ্যাক্টরী।" এ তুটোই ধ্বংস হয়েছিল আবার নূতন করে কলকব্জা বসান হয়েছে। ইস্পাতের কারখানাটি খুব বড় নয়, সম্মুখে বাগান রাস্তা, শ্রমিকদের আবাসভবন দেখে, ভল্গার তীরে এদের 'প্যালেস অফ টেকনিক' দেখলাম। এক কোটি রুবল ব্যয় হয়েছে এটি তৈরী করতে। এর নাচঘর ভোজনশালা লাইব্রেরী কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র এবং ৬০০ আসন সমন্বিত নাট্যশালা দেখলাম। শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক উন্নতি ও চিত্তবিনোদনের সব রকম ব্যবস্থা। এ ছাড়া কিণ্ডারগার্টেন হাসপাতাল শিশুপালনাগার রয়েছে।

সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে ট্রাকটর ফ্যাক্টরী। এটিকে কেন্দ্র করে একটা নূতন সহর গড়ে উঠেছে। পথের তুধারে গাছের সার ও বাগান। স্কুলগৃহ আবাসভবন ক্লাব বিপণী ছাড়িয়ে আমরা কারখানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। আপিস-বাড়ীর দোতালার হলঘরে ডিরেক্টার ও ইঞ্জিনিয়ররা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। জানালা দিয়ে দেখলাম পুরনো কারখানার ধ্বংসাবশেষ। কতকটা অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। নূতন কারখানা ২।৩ বছর হ'ল চালু হয়েছে। ত্রিশ হাজার নরনারী এই কারখানায়

কাজ করে। প্রতি পাঁচ মিনিটে এক একখানি নূতন ট্রাকটর বা মোটর চালিত অতিকায় কলের লাঙ্গল কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখলাম হাজার খানেক নূতন ট্রাকটর দেশের বিভিন্ন কৃষিকেন্দ্রে চালান হবার জন্য প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছে। রেলের খোলা মালগাড়ীতে এগুলি ক্রেনে করে তোলা হচ্ছে।

কারখানার ভেতরে প্রবেশ করলাম। এ যেন বিশ্বকর্মার কর্মশালা। বিভিন্ন বিভাগে ঘুর্ণিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে .বিভিন্ন অংশ তৈরী হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জোড়া দেওয়ার কাজও চলেছে ; যন্ত্র-চালিত ট্রলিতে এগুলি এক বিভাগ থেকে আর এক বিভাগে চলে যাচ্ছে। অবশেষে পুর্ণাঙ্গ ট্রাকটর হয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। একটি কলের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ডিরেক্টর বললেন, পূর্বে এটা চালাতে ২৪ জন শ্রমিকের দরকার হত। সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ররা এর এত উন্নতি করেছেন যে, এখন দু'জন শ্রমিকই এটা চালাতে পারে। এই দু'জনের একজন নারী শ্রমিক, তার বুকে দুটো সোনার মেডেল। ইনি সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক হিরোইন। এঁকে প্রশ্ন করলাম, যন্ত্রের উন্নতির ফলে ২২ জন শ্রমিক ছাটাই হল ; তা হলে যন্ত্রের উন্নতি কি শ্রমিকদের স্বার্থের বিরোধি নয়? উনি বললেন, তা কেন হবে? কায়িক শ্রম লাঘব করা এবং খাটবার সময় কমিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা ২২ জন কমরেডকে নূতন গঠন কাজে যোগ দেবার জন্য মুক্তি দিয়েছি। আমাদের এখানে কাউকে বেকার বসে থাকতে হয় না।

এখানে শ্রমিক নরনারীরা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, হাড়ভাঙ্গা

খাটুনির কোনো লক্ষণ নেই। প্রত্যহ ৮ ঘণ্টার বেশী খাটা আইনত নিষিদ্ধ। এখানে রবিবার নেই। শ্রমিকেরা পালা করে প্রতি ৫ দিন পর একদিন ছুটি পায়। সপ্তাহে একবার করে স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয়। বিশ্রাম ও চিকিৎসার দরকার হলে হাসপাতালে পাঠান হয়। বছরে একমাস থেকে পনর দিন ছুটি তখন এরা স্বাস্থ্যনিবাসে চলে যায়, খরচ বহন করে কারখানা। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার সতর্ক প্রহরী।

এই কারখানা সংলগ্ন ভল্গানদীর তীরে "প্যালেস অফ কালচার" এক বৃহৎ ব্যাপার। এর ২৬টি বিভাগ। শ্রমিক এবং তাদের ছেলেমেয়েদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, সঙ্গীত নৃত্য বাদ্য চিত্রকলা ভাস্কর্য শিক্ষা দেবার বিভিন্ন বিভাগগুলি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কিশোর কিশোরীরা আমাদের ব্যাণ্ড বাজিয়ে শোনাল। এর অনতিদূরে শিশুপালনাগার। মায়েরা কাজে যাবার সময় ছেলে-মেয়েদের রেখে গেছে। ছ'মাস থেকে তিন বছর বয়সের হাজার খানেক শিশু; কেউ ঘুমুচ্ছে কেউ খেলছে কেউ একাই পুতুল নিয়ে নাড়া চাড়া করছে। সেবিকারা সকলের উপর নজর রাখছেন। এরা তাদেরই ঘরের ছেলেমেয়ে, যাদের না ছিল ধন না ছিল মর্যাদা। আমাদের দেশের স্বচ্ছল ভদ্রশ্রেণীর ছেলেমেয়েরাও এত আদর যত্নে মানুষ হয় না। নবযুগের মানুষ তৈরীর কাজ এরা গোড়া থেকেই স্বুরু করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের Man making religion-এর বাস্তবরূপ দেখলাম। এরা সকলের মধ্যে একই ব্রহ্মের প্রকাশ বাস্তবনেত্রে উপলব্ধি করেছে।

যুদ্ধে অনাথ শিশু ও কিশোর কিশোরীদের ভবনে গিয়ে দেখলাম, দয়ার দানে প্রতিপালিত অনাথ আশ্রমের ভীরু বাসিন্দা এরা নয়। এরা অনাথাশ্রম বলে না, বলে শিশুদের প্রাসাদ। আমাদের দেশের দু'চারটে অনাথ আশ্রম দেখেছি; যেখানে অভাগারা ধনীর উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত হয়। কড়া শাসনে পঙ্গু মন নিয়ে নিরানন্দে থাকে। এই বা কয়টি? পথে পথে ভিক্ষা করা, নয় অচিকিৎসায় মরা এই তো সনাতন নিয়ম। এখানে দেখলাম ঠিক উল্টো। বলিষ্ঠদেহ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বালক বালিকারা আমাদের তাদের পড়ার ঘর শোবার ঘর দেখালো, ক্ষুদে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নাচগান করে খুসী প্রকাশ করলো। এরা পারিবারিক জীবনের ভাগ্য বিপর্যয়ে পরিত্যক্ত আবর্জনা নয়, এরা সমাজের সম্পদ।

অপরাহ্ণে ভল্গায় মোটর বোটে উঠেছি। কিছু দূর যাবার পর সহরের ওপারে থামলো। সকলে নেমে পড়লাম। খাড়া পাড়, বালি ঠেলে ওপরে উঠলাম। একজন বুড়ী নাতি নাতনী নিয়ে এসেছেন, স্নান করবেন। অনেকেই নেমে পড়লেন জলে। আমিও নেমে পড়লাম। আমার সাঁতারকাটা দেখে তো সকলে অবাক। কমরেড অকসানা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, বেশী দূরে যেয়ো না। কে শোনে কথা! আমি অজ বাঙ্গাল, জল দেখে ভয় পাবো! অনেক দিন পরে সাঁতার আর অবগাহন হ'ল। বোট ফিরে চলেছে, আকাশে চাঁদ উঠলো। আমার স্বদেশের সঙ্গে এর কি কোন তফাৎ আছে?

তফাৎ আছে বৈকি! এখানে কেবল নদীতে নয়, মানুষের

মনের মরা গাঙ্গেও জোয়ার এসেছে। আরো বড় স্তালিনগ্রাদ গড়ার অক্লান্ত উদ্যম চলেছে। এরা যে ভাবে চূড়ান্ত ত্যাগস্বীকার করে স্তালিনগ্রাদকে শত্রু কবল থেকে উদ্ধার করেছে সেই ভাবেই নবসৃষ্টির কঠিন দায়িত্ব নিয়েছে। আর আমার স্বদেশ কর্মনির্দেশ-হীন বাণীর বন্যাস্রোতে তৃণখণ্ডের মত ভেসে চলেছে, তুলনা করতে গেলে চিত্ত বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

ত্রিশ বর্গ মাইল জুড়ে নূতন স্তালিনগ্রাদ তৈরী হচ্ছে ; 'সিটি আর্কিটেক্টর'-এর আপিসে গিয়ে তার পরিচয় পেলাম। তিনি নূতন নগর তৈরীর পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিলেন। সহরের কেন্দ্রস্থলে তিন বর্গ মাইলের মধ্যে টাউন হল থিয়েটার স্কুল কলেজ হোটেল বাগান রাস্তার নক্সা দেখলাম ; ১৯৫৬ সালের মধ্যেই নির্মানকার্য শেষ হবে। ভল্গা নদীর উজানে যে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে ১৯৫২ সাল থেকে তার কাজ আরম্ভ হবে। সেই বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য শিল্পকেন্দ্র ও কারখানাগুলি প্রস্তুত হচ্ছে। সোবিয়েতের জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছায় চালিত সৃজনী শক্তির দুঃসাহস স্তালিনগ্রাদে মূর্ত হয়ে উঠছে।

শহীদ চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখছি বীরের শোণিত সিক্ত ভূমির ওপর শ্যামল তরুশ্রেণী অজস্র ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে, তারই স্নিগ্ধ ছায়ায় হাস্যমুখর শিশুরা খেলায় মেতেছে। এমন সময় বার বছরের একটি ছেলের হাত ধরে একটি বৃদ্ধা চলতে চলতে আমাদের দেখে দাঁড়ালেন। আমরা ভারতীয় জেনে তার বহু রেখায় কুঞ্চিত ললাটের নীচে নিষ্প্রভ চোখ দুটিতে প্রীতির প্রসন্নতা ফুটে উঠলো।

বললেন, 'তোমাদের দেশের কথা কিছু কিছু শুনেছি তোমরাও তো শান্তি আন্দোলন করছো।'

বললাম, 'আমরা শান্তিবাদী। এখানে এসে যা দেখলাম; তাতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি ঠেকান না যায় তা'হলে মানুষ সভ্যতার সব সম্পদ খুইয়ে দেউলে হয়ে যাবে।'

বৃদ্ধা হাত তুলে আঙ্গুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ খানে একটা ভাঙ্গা ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আমার পুত্র পুত্রবধূ ও কনিষ্ঠ পুত্র মেশিনগান দিয়ে শত্রুকে ঠেকিয়েছে। পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে ওরা তিনজন ঐখানেই এক সঙ্গে প্রাণ দিয়েছে। সেই দারুণ তুর্দিনের স্মৃতি এবং এই শিশুটিকে বুকে করে আমি বেঁচে আছি। স্তালিনগ্রাদের ছেলেমেয়েরা আবার শান্তির নীড় রচনা করছে, সে কি শত্রুর বোমায় ধ্বংস হবার জন্য? তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে এই কথাই বলো, আমরা যুদ্ধ চাইনে, কারো সম্পদে আমাদের লোভ নেই ঈর্ষা নেই। আমাদের সন্তানরা মানুষ হবে, বধ্যভূমির বলির পশু হবে না।'

মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতা থেকে যেন কোন বীর পুত্রের আত্মোৎসর্গের গৌরব-গর্বিতা রাজপুত নারী আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। অপরিচিত বিদেশীদের সম্মুখে তাঁর অবরুদ্ধ ভাবাবেগ সামলে নিয়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করি, ভারত-সন্তানেরা যেন নরঘাতক না হয়।' নত মস্তকে বললাম, 'মা, আজকের দিনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর নেই।'

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে শত পুত্র বিয়োগ বিধুরা গান্ধারীর বিলাপ,

আজও শত শত পতিপুত্রহীনার কণ্ঠে শোকাবেগে উদ্বেলিত। সে দিন গান্ধারীর সম্মুখে পার্থসারথী নারায়ণ হতবাক হয়ে অধোমুখ হয়েছিলেন। আজও কোরিয়া ভিয়েৎমিন মালয়ে শত সহস্র অশ্রুমুখী নারীর আর্তবিলাপ মানবতার বিচারশালার পাষাণবেদীতে নিষ্ফল মাথা কুট্‌ছে!

তের

১৫ই জুলাই বেলা এগারটায় স্তালিনগ্রাদ থেকে বিদায়। অনায়াস নৈপুণ্যে বিমান ঊর্দ্ধলোকে উঠে গেল, বায়ুমণ্ডল নিথর, পৃথিবী মেঘে ঢাকা। আমরা শীতার্ত হয়ে উঠলাম। ধুতি পিরাণের ওপর কম্বল চাপিয়ে বসে রইলাম। চার-ঘণ্টার মধ্যে মস্কৌ এসে গেলাম। এখানে এসে দেখি বেজায় গরম পড়েছে। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আজ উষ্ণতম দিন। এক জন হেসে বললেন, তোমরা ভারতীয় গরম নিয়ে এসেছ।

বেতার কেন্দ্রে গিয়ে স্তালিনগ্রাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটা বাঙ্গলা বক্তৃতা দিয়ে হোটেলে ফিরেই শুনলাম, টাস এজেন্সীর কয়েকজন সাংবাদিক আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে আমরা স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। এই প্রসঙ্গে আমি বল্লাম, 'সবই দেখলাম, কেবল বহুল প্রচারিত "লৌহ-যবনিকার" সাক্ষাৎ মিললো না। মনে হয় ও-বস্তুটি রাশিয়ায় নেই, আছে রুশবিদ্বেষীদের মগজে।' পরদিন প্রাবদায় ঐ বিবরণ প্রকাশিত হয়, 'রয়েটার' এটা লণ্ডন থেকে ভারতেও প্রচার করেন। দেশে ফিরে শুনলাম, এ নিয়ে কোন কোন সংবাদপত্রে আমাকে বিদ্রুপ ও আক্রমণ করা হয়েছে। একটু রং চড়িয়ে কেউ লিখেছেন, মস্কৌএ পৌঁছেই আমি নাকি ঐ বিবৃতি

দিয়েছি। সত্যের প্রতি কিছুটা নিষ্ঠা থাকলে তাঁরা দেখতেন আমাদের মস্কৌ আসার অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পরে আমি ঐ মন্তব্য করি, এবং দেশে ফিরে বহু জনসভায় এ কথা বলেছি।

'লৌহ-যবনিকা' কথাটি নানা উদ্দেশ্যে এবং নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম অভিযোগ— ওরা কতকগুলি পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থান ও প্রতিষ্ঠান দেখায়। স্বাধীনভাবে কিছুই দেখবার উপায় নেই। আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের 'কনডাক্টেড টুর' ব্যবস্থায় সত্যিকার রাশিয়ার জনজীবন আড়ালেই থেকে যায়।

উত্তর— অল্প সময়ের মধ্যে দলবেঁধে বেশী দেখতে হলে, সর্বত্রই এমনি ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়। এক নিশ্বাসে যারা ইয়োরোপ বা ভারত ভ্রমণ করেন, তাঁরাও টমাস কুক বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বাঁধা-ধরা স্থানগুলি দেখেন। রোমে আমার এ-অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু এখানে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। পূর্বদিন রাত্রে আমরা আলোচনা করে দ্রষ্টব্য স্থান বা প্রতিষ্ঠান ঠিক করে নিতাম। সেই অনুযায়ী এঁরা যানবাহনের ব্যবস্থা করতেন, সঙ্গে দোভাষী দিতেন। চোখকান খোলা থাকলে সহর ও পল্লীর জনজীবন বোঝা বিশেষ কিছু শক্ত নয়। রূপকথার গল্পের মত এরা চোখবেঁধে আমাদের রহস্যময় পুরী দেখাতে নিয়ে যায়নি। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার নবসৃষ্টিকে এরা গর্বের সঙ্গে বিদেশী অতিথিদের দেখাবার জন্যই আমাদের আমন্ত্রণ করেছিল। এরা রেখে ঢেকে দেখাচ্ছে বা সাজিয়ে-গুছিয়ে দেখাচ্ছে, এমন সন্দেহ

করবার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি। আলাপ করে দেখেছি, বৃটিশ কোয়েকার, নরউইজীয়ান ও আমেরিকান শ্রমিক প্রতিনিধিরাও এ বিষয় একমত। তারাও দেশে ফিরে লৌহ-যবনিকার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ— বিদেশীদের রাশিয়ায় প্রবেশ সম্বন্ধে ওদের কড়াকড়ি ও সন্দেহ অত্যন্ত প্রবল।

উত্তর— এ অভিযোগটা ওরাও অস্বীকার করে না। মনে রাখতে হবে ধনতান্ত্রিক জগতের বৈরিতা ও বয়কট সোবিয়েত ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমান প্রবল। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধে জার্মানীর শক্ত পাল্লায় পড়ে ততোধিক শক্তিমান সোবিয়েত রাশিয়ার প্রেমে যাঁরা ডগমগ হয়ে উঠেছিলেন, ফাঁড়া কেটে যাবার পর তাঁরাই সুর ঘুরিয়ে ফেলেছেন। সমগ্র ইয়োরোপ 'লাল' হয়ে গেল বলে ধনতন্ত্রীদের আর্তনাদ ও সোবিয়েত বিদ্বেষ ১৯৪৭ থেকেই সুরু হয়েছে। এতে রুশদের চিত্ত প্রীতি প্রসন্ন ঔদার্যে ভরে উঠ্‌বার কথা নয়। ধনতন্ত্রীদের গুপ্তচর ও স্পাই ইনফরমার সম্বন্ধে এরা সজাগ এবং ধ্বংসাত্মক কাজ সম্বন্ধে সতর্ক। সাংবাদিকের ছদ্মবেশে গুপ্তচরবৃত্তির অনেক প্রমাণ এরা পেয়েছে। আন্তর্জাতিক হৃদ্যতার আদান-প্রদান পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে জানবার ও বুঝবার ওপর নির্ভর করে। বর্তমান জগতে তা' দুর্লভ।

তৃতীয় অভিযোগ— লৌহ-যবনিকার অন্তরালে এরা কোটি কোটি লোককে বন্দীশিবিরে রেখে ক্রীতদাসের মত খাটায়, উরাল

অঞ্চলে বা সাইবেরিয়ার জঙ্গলে এমন অমানুষিক ব্যবস্থা আছে।

উত্তর— রাশিয়ার শ্রমিক সাধারণের স্বচ্ছলতা, সম্মান ও মর্যাদা যা চোখে দেখেছি, তাতে এমন ব্যাপার অসম্ভব। যা মিথ্যা নিন্দা, যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করা যায় না।

চতুর্থ অভিযোগ— ওরা 'লৌহ-যবনিকার' আড়ালে বিশ্বজয়ের দুরাশা নিয়ে বিপুল সামরিক বল গড়ে তুলছে।

উত্তর— এটা ঈসপের গল্পের মেষশাবককে হত্যা করার নেকড়ে বাঘের যুক্তি। শত বর্ষ পূর্বে কবি হেমচন্দ্র লিখেছিলেন, "হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়, পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়।" তার প্রকট মূর্তি আজ তো প্রত্যক্ষ। নবীন ইয়োরোপ, পুরাতন ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারী হবার আশায় ইয়োরোপ এশিয়াময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন, তার একটা যুক্তি আবিষ্কার করবার জন্য 'লৌহ-যবনিকাটা' পাকাপোক্ত করা দরকার। আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এরা সব দেশেই ঢুকেছেন। প্রশ্ন করলে ডান হাতের রাইফেল উঁচু করে, বা'হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা পিঠের পেছনে উঁচিয়ে ধরে বলেন, ঐ যে! ঐ যে কি? বোঝ না, লাল জুজু আসছে। তোমাকে তো বাঁচাতে হবে! আমি নিজেই বাঁচবো, তুমি সরে পড়! বল্লেই হ'ল, যেখানে স্বাধীন জগত বিপন্ন, সেখানে তুমি একা কি করবে? নিজেও মরবে আমাদেরও মারবে। লৌহ-যবনিকার খাঁচায় লাল জুজুকে আটকে রাখতে হলে, 'প্যাক্ট-যবনিকা' দরকার।

আমার স্বদেশে এ সব বালাই ছিল না। আমাদের সদর দরজা হাজার বছর ধরে উন্মুক্ত। গ্রীক যবন, শক হুন তুর্কী পাঠান মুঘল, ইংরাজ ফরাসী পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ সকলেই এসেছে। স্বাধীন হবার পরও পশ্চিমাদের প্রবেশদ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত। আমাদের পক্ষেও স্বাধীন ভাবে ইয়োরোপ আমেরিকায় যেতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই। কিন্তু চীন ও রাশিয়ায় যেতে চাইলেই 'খাদি যবনিকা'য় ধাক্কা খেতে হয়। আমেরিকা ইংলণ্ডেও সেই দশা। বিশেষ শ্রেণীর লোকের ছাড়পত্র নিয়ে প্রবেশ ও নির্গমন দুইই দুরূহ। সম্প্রতি বার্লিন যুব উৎসবে যোগদানে তরুণ তরুণী-দের ছাড়পত্র না দেওয়ার কড়াকড়ি ভারতে বৃটেনে আমেরিকায় আমরা দেখলাম। কাজেই কাঁচের ঘরে বাস করে অপরের প্রতি ঢিল ছোড়া খুব নিরাপদ খেলা নয়। আন্তর্জাতিক রেষারেষিতে নিরপেক্ষ ভারত কোন শক্তি শিবিরে যোগ দেবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জহরলালের ভারতে আসবার জন্য রাশিয়ান প্রতিনিধি দল অনুমতি পায় নি; ভারতীয়দের অনেকেই রাশিয়ায় যাবার অনুমতি পায় না, কিন্তু আমেরিকার বেলায় এমনটি হয় না। যবনিকার পর যবনিকা আছে। তা লোহারই হোক আর যাই হোক।

চৌদ্দ

মস্কোর উপকণ্ঠে লেনিন পর্বতের ওপর নির্মীয়মাণ নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়। ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কাজ আরম্ভ হয়েছে, ১৯৫২-এর ডিসেম্বর মাসে কাজ শেষ হবে। এত দ্রুত একটা গোটা নগর শুদ্ধ সুবিশাল অট্টালিকা তৈরী, সোবিয়েত ইঞ্জিনিয়র ও শ্রমিকদের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। আমরা দেখলাম, মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে এসেছে। প্রধান স্থপতি তাঁর কার্যালয়ে আমাদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলেন। কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ষোল শ' বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় বিভাগটি ৩৬ তলা উঁচু। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বাড়ী থেকে বিজ্ঞানের ছয়টি বিভাগ এখানে সরিয়ে আনা হবে। কেন্দ্রে থাকবে খনি-বিজ্ঞান ভূ-বিজ্ঞান যন্ত্র-বিজ্ঞান গণিত ও ভূগোল বিভাগ, পাশের বাড়ীগুলোতে পদার্থবিদ্যা রসায়ন ও জীববিজ্ঞান। একটা বিশেষ বাড়ী তৈরী হচ্ছে যেটা মানমন্দির বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাগার। বিজ্ঞানের গবেষণা ও অগ্রগতির জন্য এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠায় প্রথম কিস্তীতে সোবিয়েত সরকার তিন কোটি রুবল ব্যয় করেছেন। এই আবাসিক বিদ্যালয়ে ছয় হাজার ছাত্র ও দু' শ' অধ্যাপক থাকবেন। আমরা এর নমুনা দেখলাম। ছাত্রদের কক্ষগুলিতে পড়াশোনা বিশ্রাম ও সংলগ্ন স্নানাগারের ব্যবস্থা; আর

অধ্যাপকদের জন্য সুদৃশ্য আসবাবে সজ্জিত তিনখানি ঘর স্নানাগার, রন্ধনশালা বৈদ্যুতিক চুল্লী প্রভৃতি।

এ ছাড়া বার লক্ষ খণ্ড পুস্তক সমন্বিত লাইব্রেরী, যন্ত্রচালিত টিউবের মধ্য দিয়ে কোন বই চাইবার দশ মিনিটের মধ্যে ছাত্র ও অধ্যাপকদের টেবিলে এসে পৌঁছবে। দু'শো নব্বই বিঘে জমির ওপর তৈরী হচ্ছে বোটানিকেল গার্ডেন। দেশদেশান্তরের তরু-লতার সমাবেশ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণার ব্যবস্থা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সাজ সরঞ্জামের বিবরণ শুনতে শুনতে প্রধান স্থপতিকে বললাম, 'আপনাদের প্রত্যেক পরিকল্পনাই বৃহৎ।' তিনি হেসে বললেন, 'রাশিয়া বৃহত্তর।'

শুনলাম আগামী বছরেই কাজ আরম্ভ হবে। কোরিয়া ও চীন থেকে ছয় শত ছাত্র ছাত্রী যোগদান করবে। ভারতীয় ছাত্ররা এখানে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি হেসে বললেন, নিশ্চয়ই পারে। আমরা তো সব দেশের ছাত্র গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু বাধা আছে। প্রথম বাধা তোমাদের দেশে এক জন গ্রাজুয়েট যে পরিমাণ ইংরেজী শেখে, ততটা রুশ ভাষা শেখা দরকার। আমাদের অধ্যাপকরা ইংরেজী জানেন না। দ্বিতীয় বাধা, তোমাদের গভর্ন-মেণ্ট জোয়ান ছেলেমেয়েদের কি এদেশে আস্তে দেবে? শেষের বাধার উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রথম বাধার কথা শুনে আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষিতরা উচ্চ হাস্য করবেন। ইংরেজী জানে না; তা হলে অধ্যাপক হতেই পারে না। এমন কথা বললে এদেশের

শতকরা ৯৯ জন সায় দেবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা হতে পারে, এ কথা বলতে সাহস হয় না। পাঠশালায় ওটা চলতে পারে কিন্তু কলেজে অচল। পরের ভাষায় জ্ঞানলাভের সাধনা পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশে নেই। মাতৃভাষা এদেশে এতই অবজ্ঞেয় যে, ইংরেজী জানি না একথা বলা অপরাধ। রাশিয়ার নামজাদা সাহিত্যিকদের দেখলাম, ইংরেজী জানেন না একথা বলতে আমাদের মত লজ্জায় তাদের কর্ণমূল আরক্তিম হয়ে ওঠে না। সম্প্রতি আমাদের দেশে উত্তর ভারতের গ্রাম্য কথ্য-ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালাবার উৎসাহ দেখছি। পণ্ডিত ব্যক্তিরা হায় হায় করছেন, স্কুল কলেজে ইংরেজী শিক্ষা না দিলে শিক্ষাই লোপ পাবে। এদের কুযুক্তির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ইংরেজী হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না এমন কথা বলাও যা আর ইংরেজী ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক সাধনা হতেই পারবে না এও বলা তাই।'

হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে মেনে নেয়া হয়েছে এতে আপত্তি করিনে, কিন্তু প্রাদেশিক প্রাচীন ও বেগবান ভাষাগুলিকে কোণঠাসা করে হিন্দী চালাবার উদ্যম দেখে দুঃখ পাই। অন্ততঃ আমাদের প্রতিবেশী বিহার প্রদেশে এই চেষ্টা চলছে। বঙ্গ ভাষাভাষীদের বিদ্যালয়গুলির ওপর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, হিন্দীর মাধ্যমে ইতিহাস বিজ্ঞান গণিত ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া

হবে। পুরুলিয়ায় একটি পুরাতন মেয়েদের ম্যাট্রিক স্কুলের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার মোহ এতই প্রবল! মাতৃস্তন্য যেমন শিশুর পক্ষে তেমনি মাতৃভাষা জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশ ও পুষ্টির জন্য আবশ্যক। বহু ভাষাভাষী ভারত এ ব্যাপারে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবে। আমি এখনও এই আশা পোষণ করি।

রুশ ভাষা সকলেই শেখে; কিন্তু বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষাতেই এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা। জর্জিয়ার তিবলিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখলাম উচ্চশিক্ষা জর্জিয়ান ভাষাতেই দেওয়া হয়। জর্জিয়ানদের মাতৃভাষা প্রীতি এত প্রবল যে তারা নিজেদের মধ্যে জর্জিয়ান ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলে না। রুশদের সঙ্গে এরা রুশভাষায় কথা বলে; কিন্তু বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে মাতৃভাষায় কথা বলে, তা ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমাদের দোভাষীকে বোঝাতে হয়েছে। উজবেকিস্তানেও এই দেখলাম। উজবেকদের লেখ্য ভাষার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর এখানেও পঠন পাঠন উজবেক ভাষায় হয়, বহু রুশ জার্মান ফরাসী সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের বই উজবেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

পনর

১৭ই জুলাই। মস্কো থেকে সকাল ৮টায় বিমান ছাড়ল। খারখোভ রস্টভ ছেড়ে বিমান চলেছে; নীচে কৃষ্ণসাগরের নীলজল। সোকোনিতে বিমান থামল। চা পানের পর ককেসাস পর্বত-মালার ওপর দিয়ে অপরাহ্ণ ৭টায় বিমান জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসি বিমান ঘাঁটিতে নামল। স্থানীয় লেখকসঙ্ঘ যথারীতি অভ্যর্থনা করলেন।

চারিদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত উপত্যকায় অসমতল তিবলিসি শহর, মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা কুরা নদী এঁকে বেঁকে চলেছে; তার দু'পাশে ফার পপলার চেনার পাইন গাছের সার, মাঝে মাঝে বাগান, নানা রংয়ের অজস্র ফুল। এ কোন স্বপন পুরীতে প্রবেশ করলাম। চওড়া পরিচ্ছন্ন রাস্তা, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ-ভাতি বিদ্যুতালোকে চারিদিক প্রসন্ন। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি, যদি সুউচ্চ সৌধমালা চারিদিকে না থাকতো তা হ'লে দার্জিলিং বলে ভ্রম হত। পুনা ও হায়দ্রাবাদ হাত ধরে মিলে মিশে দাঁড়িয়েছে, একথা বললেও এ সুন্দরী নগরীর তুলনা হয় না। সম্মুখে পাহাড়ের চূড়ায় প্রমোদভবন আলোয় আলোময় হয়ে শোভা পাচ্ছে।

ধ্যান ভেঙ্গে গেল, কমরেড অকসানা দেবী ডাকছেন, পাশ্‌লি পাশ্‌লি, অর্থাৎ ত্বরা করো।

হোটেলের একতালায় একটি ভোজন কক্ষ। সুসজ্জিত টেবিলে নানাবিধ খাদ্য ও মদ্যের সমাবেশ। জর্জিয়ার প্রাচীন প্রথা অনুসারে ভোজসভার একজন নেতা নির্বাচন করতে হয়। জর্জিয়ার লেখকসঙ্ঘের সভাপতি কবি গেয়রগি লিওনিট্সে (Georgi Leonitze) ভোজসভার সভাপতি অর্থাৎ "তামাদা" নির্বাচিত হলেন। এ দেশের নিয়ম খাদ্য পানীয় সম্পর্কে তামাদার নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করতে হবে। লিওনিট্সে 'শালপ্রাংশু মহাভূজ পুরুষ' প্রশস্ত ললাটের নীচে উজ্জ্বল নীলচক্ষু, সুগঠিত দেহে যৌবনের প্রাচুর্য। জর্জিয়া আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের উৎকৃষ্ট সুরার জন্য প্রসিদ্ধ। জর্জিয়ার 'স্যাম্পেন', ফ্রান্সের পৃথিবী বিখ্যাত স্যাম্পেনের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ভোজন আরম্ভ হ'ল। বারম্বার 'স্বাস্থ্যপান' এবং পানপাত্র এক চুমুকে নিঃশেষ করতে হবে। এখানে ভোজসভা এক বিরাট ব্যাপার, সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে শেষরাত্রি পর্যন্ত পান ভোজন নৃত্য গীত বিরামহীন ভাবে চলে। গল্প শুনলাম, কোন গ্রামে এক 'তামাদা' তিন দিন তিন রাত সমানে ভোজসভায় নৃত্য গীত চালিয়েছিলেন। আমাদের 'তামাদা' এতটা নিষ্ঠুর না হলেও সহজে রেহাই দিলেন না; রাত্রি এগারটায় নিয়ে গেলেন পর্বতচূড়ার ওপরে এক সুরম্য প্রমোদ নিকেতনে। আবার ভোজসভা বসল, নিস্তেজ সুরভিত সুমিষ্ট সুরা। তবুও সুরা তো ব'ট! আমাদের 'তামাদা' এবং জর্জিয়ান লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'স্বাস্থ্যপান' আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা কৌশলে সুরার পরিবর্তে গ্লাসে লিমোনেড

ঢেলে ওঁদের 'স্বাস্থ্যপানে' আহ্বান করতে লাগলাম। 'তামাদা' মিটমিট করে চাইলেন, কিন্তু হটবার পাত্র তিনি নন। আমাদের লিমোনেডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি 'স্যাম্পেন' দিয়ে পানপাত্র পূর্ণ করতে লাগলেন। রাত্রি একটায় সভা ভাঙ্গলো, চরাচর পরিব্যাপ্ত চন্দ্রালোক আকাশে মোহ রচনা করেছে, নিম্নে আলোকমালামণ্ডিত তিবলিসি নগরী।

তিবলিসি প্রায় হাজার বছরের পুরাতন সহর। সহরতলীতে সুতা কাপড় ইস্পাত ও জলবিদ্যুতের কারখানা গড়ে ওঠায় লোক সংখ্যা বেড়ে প্রায় তিন চার লাখ হয়েছে। সহরে জর্জিয়ান ছাড়াও রুশ আর্মেনিয়ান তাজিক তুর্কী কাজাক প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির লোক দেখতে পাওয়া যায়। গির্জা মসজিদ এবং প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া পুরাতন নিদর্শন কম। এখন বাড়ী ঘর রাস্তা সবই আধুনিক। এর কারু-কার্য, দেয়ালচিত্র আসবাবপত্রে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। জর্জিয়ানরা জাতীয় সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী, সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে গর্ববোধ করে থাকে।

উত্তর পশ্চিম এশিয়ায় জর্জিয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ। ১৮ হাজার ফুট উঁচু ককেসাস পর্বতমালার তরঙ্গায়িত কোলে কোলে অপূর্ব শোভাময় উপত্যকায় ভরা জর্জিয়ার উর্বর ভূমি কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানেই বাকুর বিখ্যাত তেলের খনি, এ ছাড়া নানাস্থানে ম্যাঙ্গানিজ তামা ও লোহার খনি আছে। সোবিয়েত আমলে তিবলিসিতে প্রকাণ্ড ইস্পাতের কারখানা গড়ে উঠেছে।

সাহসী অতিথিবৎসল পরিশ্রমী বুদ্ধিমান সুগঠিত দেহ আর্য বংশীয় জর্জিয়ান জাতির তু'হাজার বছরের ইতিহাস— রাজ্য ও সাম্রাজ্য ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস। সম্রাট আলেকজেণ্ডার, বাইজানটাইন, চেঙ্গিস খাঁ, তিমুর প্রভৃতি দিগ্বিজয়ীদের চতুরঙ্গবাহিনী এদেশে প্রবেশ করেছে, তাদের ধ্বংসলীলার কাহিনী এরা ভোলেনি। যুগে যুগে এরা স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছে। এদের লোক-সঙ্গীত ও গাঁথার মধ্যে পূর্বপুরুষের সেইসব বীরত্ব কাহিনী ছড়িয়ে আছে। দশম শতাব্দীর কবি রুস্তাভেলীর কাব্যে গল্প আছে এক ভারতীয় রাজকন্যা জর্জিয়ার রাণী ছিলেন। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে জর্জিয়াকে রুশ সাম্রাজ্য গ্রাস করে। শতাব্দীর শেষভাগে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় জর্জিয়ানরা বিদ্রোহ করেছিল। জার গভর্নমেণ্ট নিষ্ঠুর অত্যাচারে সে বিদ্রোহ দমন করে ফেলেন। প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এই নিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যেই মানবমুক্তির পুরোধা স্তালিনের আবির্ভাব।

তিবলিসিতে প্রথমেই চোখে পড়লো, পুরুষেরা বসন ভূষণে একদম ইয়োরোপীয়, তবে সাধারণতঃ 'টাই' পরে না। মেয়েদের বসনে সাজসজ্জায় প্রাচ্যের অলঙ্কার প্রিয়তা আছে। প্রসাধনে মস্কোএর নারীদের চেয়ে এরা বেশী সজাগ। খাদ্যের বেলায় এরা প্রাচ্যেই আছে, আমাদেরই মত মশলা ব্যবহার করে, কাঁচা লঙ্কা ও কচি পেঁয়াজ খাবারের টেবিলের শোভাবর্ধন করে। রান্নায় ইরানী প্রভাব আছে, পোলাও ও কাবাব (শাসলিক) যথেষ্ট। এদের বাড়ীঘর আসবাবপত্র শিল্পকলায় ইরানী-সংস্কৃতির ছাপ

সুস্পষ্ট। পরাধীনতা এবং তার ফলে দারিদ্র্য অশিক্ষা কুসংস্কার এবং সামন্তযুগের দাসত্বের পাঁক থেকে এরা মাত্র পঁচিশ বছর হলো উদ্ধার পেয়েছে, এবং আজ এদের দেহে মনে পুরাতন গরিবী ও ভীরুতার কোন ছাপ নেই।

সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি শিশুপালনাগার কিণ্ডারগার্টেন হাসপাতাল সংস্কৃতিভবন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত। জর্জিয়ার লোক সংখ্যা ৩৩ লক্ষের মত, অথচ এদের বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস আকারে আয়তনে সাজসজ্জায় ভারতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বড়। জর্জিয়ার শিক্ষামন্ত্রী বললেন, এঁদের রাজস্বের অর্ধেক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। আমাদের বৃহৎ কারখানার আয় থেকে স্বাস্থ্য ও লোকহিতকর কাজ করা হয়, কাজেই শিক্ষার জন্য এত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশের ব্যয় রাজস্বের শতকরা সাত ভাগ মাত্র!

প্রথমরাত্রে যে পাহাড়ের চূড়ায় প্রমোদভবনে আমরা মোটরে গিয়েছিলাম, সেই পাহাড়ে স্বতন্ত্র পথ দিয়ে ইলেকট্রিক রেলে (Finicular Railway) ওঠা গেল। সোজা খাড়া ওপরে উঠে যায়, গা শির শির করে। ট্রেন থেকে নেমে ডান দিকে অগ্রসর হলাম। ষষ্ঠ শতাব্দীর পুরাতন গীর্জা। অনেক মূর্তি ও দেয়ালচিত্র আছে। এর প্রাঙ্গণে কবি ও লেখকদের সমাধি। এক পাশে আচ্ছাদনহীন কৃষ্ণমর্মর পাথরে রচিত স্তালিন জননীর সমাধি। ইনি অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে তিবলিসিতেই বাস করতেন। ১৯৩৭ সালে অতি বৃদ্ধা হয়ে ইনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই তিবলিসি সহরেই খৃস্টান পাদ্রীদের বিদ্যালয়ের ছাত্র স্তালিন মার্কসবাদে দীক্ষা লাভ করেন। শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংস্থা গঠন করবার ভার নিয়ে তিনি ১৮৯৪ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে কাটিয়েছেন, জেলে গিয়েছেন, জেল থেকে পালিয়ে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বলশেভিক মতবাদ প্রচার করেছেন। ১৯০৩ সালে জেল থেকে পালিয়ে এসে স্তালিন এক গুপ্ত ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে নিষিদ্ধ পুস্তক, সাময়িক পত্র, ইস্তাহার প্রভৃতি প্রকাশ করা হ'ত। পুলিশ দু'বছর পাগলের মত ছাপাখানাটি খুঁজেছে। রাশিয়ান জর্জিয়ান আর্মেনিয়ান আজার বাইজান নানা ভাষায় এখান থেকে বই, সাময়িক পত্র প্রকাশিত হ'ত। আমরা এই গুপ্ত ছাপাখানাটি দেখলাম। একটি সত্তর ফুট গভীর কূপের মাঝামাঝি সুরঙ্গ কেটে বাড়ীর তলায় গর্ভগৃহ রচনা করা হয়েছিল। দড়ীর পুলী মৈ-এর সাহায্যে কর্মীরা যাতায়াত করতেন। হাতে চালানো ছাপাখানা এবং বিভিন্ন ভাষার হরপ ছিল। ১৯০৬ সালের ১৫ই এপ্রিল জারের পুলিশ ছাপাখানা আবিষ্কার করে। এ বাড়ীটা এখন ম্যুজিয়ম।

তিবলিসি সহর যন্ত্রশিল্পের এক প্রধান কেন্দ্র। আমরা একটা সূতো ও মোজা গেঞ্জীর কারখানা দেখলাম। দেখলাম শ্রমিকদের আবাস বিশ্রাম ভবন শিশুপালনাগার। সমস্ত দিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, একটা বৃহৎ বাগানে গেলাম বিশ্রাম করতে। বেলা পড়ে এসেছে, দলে দলে নরনারী আসছে, সঙ্গে ছেলেমেয়েরা। নানাস্থানে ছেলেদের খেলার জায়গা, কোথাও নাচগান হচ্ছে।

এ যেন একটা আনন্দমেলা— জীবনের পরিপূর্ণ প্রাচুর্য চারিদিকে ঝরণার জলের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

এই বাগানে ছোটদের দু'মাইল লম্বা একটা রেলপথ আছে। ১৯৩৫ সালে এটি তৈরী হয়। দু'তিন জন বয়স্ক পরিদর্শক আছেন, কিন্তু টিকিট বিক্রেতা স্টেশন মাস্টার গার্ড কনডাকটার ইঞ্জিন-চালক সকলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। গাড়ী ও ইঞ্জিন আকারে প্রায় শিলিগুড়ী দার্জিলিং লাইনের গাড়ীর মত। জমকালো ইউনিফর্ম পরা ছোটদের ভারিক্কীচালে কাজকর্ম দেখে আমরা কৌতুকবোধ করলাম। এক রুবল ভাড়ায় যাতায়াত হয়; মাঝে চারটি স্টেশন। আমরা গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম, যাত্রীর মধ্যে ছেলেমেয়ে বেশী হলেও বয়স্ক নরনারীর অভাব নেই। বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়লো, একটি কিশোরী কনডাকটার গম্ভীর মুখে টিকিট পরীক্ষা করল। রেলওয়ে পরিচালনা ছেলেবেলায়ই হাতে কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভারী মজার খেলা বলে মনে হ'ল।

ষোল

১৯শে জুলাই প্রভাতে তিবলিসি থেকে গোরী যাত্রা করা গেল। কুরা নদীর তীর দিয়ে মোটর চলেছে এঁকে বেঁকে। পাহাড়ের কোলে গ্রাম, নদীর ওপারে ছোট ছোট ধানক্ষেত দেখলাম, আমাদের দেশের মতই আল দেওয়া। ধানের জমিতে জল আটকে রাখতে আলের দরকার হয়। ত্রিশ মাইল দূরে কুরা নদীর দু'পারে সহর প্রাচীন রাজধানী। নদীর ওপর রোমানদের তৈরী সেতু এখনও রয়েছে। প্রাচীন দুর্গের প্রাচীর খাড়া রয়েছে— গঠনভঙ্গী ভারতের মুঘল যুগের দুর্গ-প্রাচীরের মত। ভিতরে একটা বৃহৎ গীর্জা ছাড়া কিছুই নেই। পঞ্চম শতাব্দীতে তৈরী এই গীর্জা হাজার বছর পর তিমুর লঙ্গ লুট করেন, তারপর অনেকদিন সংস্কার হয় নি। গত শতাব্দীতে সংস্কার করা হয়েছে। এই গীর্জায় যীশু খৃষ্টের একখানা ছোট আগ্রীবা ছবি আছে। একদৃষ্টে চাইলে মনে হয় ছবির চোখ ধীরে ধীরে বুঁজে যাচ্ছে এবং খুলছে। চিত্রকরের বাহাদুরী আছে।

চেনার ও ওক গাছের ছায়ায় ঢাকা এক গ্রামে এসে আমাদের মোটর থামলো। দলে দলে নরনারী আমাদের দেখতে এসেছে। ভোজসভা বসলো গাছতলায়, ভোজ্য পানীয়ের বিপুল আয়োজন। জর্জিয়ান আতিথেয়তার উদার অজস্রতা। আমাদের তাড়া আছে,

তাই মাত্র দু'ঘণ্টা পরে তাঁরা দুঃখের সঙ্গে বিদায় দিলেন। গাড়ী ছুটলো। পাহাড়ের চূড়া তরঙ্গায়িত; সুদৃশ্য গ্রাম, দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, শ্যামল বনভূমি, মাঝে মাঝে দুরন্ত নদীকে বশ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র দেখতে দেখতে আমরা স্তালিনের জন্মভূমি গোরীতে এসে উপস্থিত হলাম।

সেকালে গোরী ছিল ছোট গঞ্জের মত সহর, এখন তার পুরনো দিনের চেহারা একদম বদলে গেছে। কেবল পূব দিকে প্রাচীন দিনের স্মৃতি নিয়ে পাহাড়ের ওপর পরিত্যক্ত বাইজানটাইন দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে, গ্রীক্ রোমক তুর্কী মুঘল ইরানী রাশিয়ানদের অভিযানে কতবার হাত বদল হয়ে, এখন নিস্তব্ধ। এ ছাড়া বাড়ী ঘর দোর ট্রাম বাস সবই আধুনিক; সামন্ততান্ত্রিক যুগের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে। প্রকাণ্ড হোটেল ও পান্থনিবাস হয়েছে ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের জন্য। স্তালিনের জন্মভূমি বিশ্বমানবের মুক্তি-কামীদের তীর্থক্ষেত্র ছাড়া আর কি?

ছোট উদ্যান, লাল ও সাদা গোলাপ চারদিকে ফুটে আছে, একদিকে নীল পাইনের গাছগুলি অস্তসূর্যের আলোয় পুঞ্জ পুঞ্জ নীলমেঘের মত স্থির হয়ে আছে। তারি সম্মুখে চতুষ্কোণ মর্মরবেদী, মর্মর স্তম্ভের ওপর কাঁচের ছাদের নীচে পাশাপাশি দুটো জাফরী ইটের তৈরী ছোটঘর। একটাতে থাক্‌তেন ভাড়াটে রূপে ভিসারিয়ান-দম্পতি। একজন চর্মকার, অপর কৃষক-দুহিতা। অপর ঘরটি ছিল বাড়ীওয়ালার। দরিদ্র শ্রমিকের এই কুটিরে জননী ক্যাথারিনা ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর চতুর্থ সন্তান স্তালিনকে

প্রসব করেন। পর পর তিনটি সন্তান স্থতিকাগারেই মারা যায়। এটি বাঁচলো। পিতার ইচ্ছা পুত্রকে একজন উত্তম চর্মকার রূপে গড়ে তোলা, মার ইচ্ছা তাঁর পুত্র লেখা পড়া শিখে পাদ্রী হবে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধান অন্যরূপ। বহুনিন্দিত বহুবন্দিত স্তালিন আজ বিশকোটি বন্ধন মুক্ত নরনারীর নেতা গুরু উপদেষ্টা, সর্বদেশের মানবমুক্তিকামীদের শ্রদ্ধেয় দিশারী!

সেই তক্তপোষ মলিন বিছানা কাঠের তোরঙ্গ টেবিলের ওপর কিছু সাধারণ ভোজ্য পাত্র জলের জগ আর কেরোসিনের বাতি। নরকেশরী স্তালিনের জন্মস্থান, সম্ভ্রমে মাথা নত হ'ল, যুক্তকর অজ্ঞাতসারেই করল ললাট স্পর্শ। বাঙ্গলা ভাষায় স্তালিনের জীবন-চরিত লেখকরূপে এ আমার জীবনে এক দুর্লভ সৌভাগ্য। বহুবর্ষ পূর্বে গোরক্ষপুর থেকে শালবন ঘেরা লুম্বনীতে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান দেখে যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, তেমনি ভাবাবেগে হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠ্‌লো। আড়াই হাজার বৎসর ব্যবধানে দুই পৃথক মতবাদ ও আদর্শ নিয়ে মানব-মুক্তিকামী দুই মহাপুরুষের অভ্যুদয়। বুদ্ধদেবের মহিমা কীর্তন করে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন "আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগত ভকতি প্রণত চরণে যার।" আমি যদি এ কথা বলি বিংশ শতাব্দীতে অর্ধজগত জীবিত স্তালিনকে বন্দনা করে তবে তা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। প্রভাতের ভানু আর মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডে প্রভেদ থাক্‌লেও যোগ আছে।

বুদ্ধদেব ও স্তালিনের নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করলে আমাদের

দেশে অনেকের কানে তা বেসুরো শোনাবে এ আশঙ্কা আমার মনে আছে। সে সময়ে আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তা অসঙ্কোচে খুলেই বলি। মানব-সভ্যতার শৈশব থেকে সমাজ স্থিতির কতকগুলো 'আইডিয়া' (ধারণা ?) সভ্যতার গতিপথের নিয়ামক। এর বিকাশ ও বিস্তারের ধারায় যতই বৈচিত্র্য থাকুক, স্ব-স্বরূপে অনিত্য সংসারে এটা নিত্যবস্তু। বৈষ্ণব পদকর্তা বলেছেন, "স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কখনো নাহিক হয়।" সমাজের বিবর্তনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের মূলে একটা 'আইডিয়া' কাজ করছে। আইডিয়া মানসলোক থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে মূর্তি নেয়, বিলম্বে ও ক্লেশকর পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অধিকার ভেদের বিরুদ্ধে, মানুষের লোভ ও দুর্বুদ্ধির বিরুদ্ধে নৈতিক সংগ্রাম যুগে যুগে রূপ থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাচীন যুগে যা ছিল আধ্যাত্মিক হৃদয়াবেগ, বর্তমান যুগে তাই বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ। বেদের ভাষায়, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

বাগানের বেঞ্চে বসে দেখছি, নানাদেশের নরনারী এসেছে স্তালিনের জন্মভূমি দেখতে। তীর্থদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাবার জন্য ফটো তোলাচ্ছে ; তিন জন ফটোগ্রাফার বেশ দু'পয়সা রোজগার করছে। আমাদের দেশে এবং সব দেশেই এমন আগ্রহ লোকের আছে। রোমে সেণ্ট পিটার্স চার্চেও দেখেছি তীর্থযাত্রীরা চার্চের পরিপ্রেক্ষিতে ফটো তোলাচ্ছে। আমরাও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালাম। মানব প্রকৃতি সর্বত্রই একরকম। আমরা যে ভাব

নিয়ে পুরী কাশী বৃন্দাবন যাই সেই ভাব নিয়ে এরাও এসেছে সুবৃহৎ সোবিয়েত ইউনিয়নের নানা প্রান্ত থেকে।

পাশেই স্তালিন ম্যুজিয়ম। স্তালিনের ছাত্রজীবন ও পরিণত বয়সের অনেক নিদর্শন সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ফটো ও ছবি প্রচুর। কিশোর বয়সে স্তালিন কবিতা লিখতেন এটা জানা ছিল না। প্রেমের কবিতা নয়, দেশপ্রেমের কবিতা। পরাধীনতার বেদনা ও জর্জিয়ান জাতীয়তাবাদ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

স্থানীয় হোটেলে ভোজের আয়োজন। গোরীর লেখক ও কবিরা এসেছেন, শ্রমিকসঙ্ঘের নেতারাও আছেন। রকমারী সুস্বাদু সুরা এবং প্রচুর অন্ন-ব্যঞ্জনের সমাবেশ। তার চেয়েও বেশী উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা। ভারত ও সোবিয়েতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করলেন একাধিক বক্তা। আমরাও কম গেলাম না। বহুদিন পর গৃহাগত প্রিয়জনকে দেখে যে আনন্দ হয়, এরা যেন সেই আনন্দে আত্মহারা। জর্জিয়া ও ভারত, হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পিতৃপরিচয় একই ছিল, সে নাড়ীর যোগ এখনো রয়েছে।

সতর

রাত্রি দশটায় গোরী থেকে ট্রেন ছাড়লো, আমরা চলেছি কৃষ্ণ সাগরের তীরে বন্দর ও স্বাস্থ্যনিবাস সুকুমীতে। চাঁদের আলোয় পাহাড় পাইন বন ও আলোকিত গ্রামগুলির এক অপরূপ শোভা। সমতল ভূমির অধিবাসী বাঙ্গালীর সমুদ্র পর্বতের ওপর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। রূপের পূজারী বাঙ্গালী এই টানেই পুরীতে যায়, দার্জিলিং শিলং পাহাড়ে যায়। সারাদিনের শ্রমের ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন পূর্বাকাশ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। পথের দু'ধারে ভুট্টার ক্ষেত, এরা বলে "ভারতীয় শস্য।" ভারত থেকেই হয় তো ভুট্টা এ দেশে এসেছিল। একদিন এখানে দরিদ্রদের ভুট্টাই ছিল প্রধান আহার যেমন আমাদের দেশের বিহার অঞ্চলে। এখন মানুষ হয়তো সখ করে খায়, আসলে পশুর খাদ্যরূপেই প্রধানত এর ব্যবহার।

কৃষ্ণসাগরের তীর দিয়ে ট্রেন চলেছে। নিস্তরঙ্গ নীল জলের বিস্তারে সাদা পাল তোলা নৌকা ভাসছে, ছোট স্টীমারের চাকার আবর্তে ফেনিল জলের তরঙ্গ। উপল আস্তীর্ণ তটভূমিতে সমুদ্রস্নানে ক্লান্ত নরনারীরা রোদ পোহাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্নান করছে। মাঝে মাঝে সরবত কুলপী বরফ আর ফলের

দোকান। সমুদ্রের ধারে যেন মেলা বসে গেছে। রাশিয়ার নানা প্রান্ত থেকে শ্রমিকেরা সপরিবারে স্বাস্থ্যনিবাসে এসেছে।

বেলা দশটায় স্থকুমী স্টেশনে ট্রেন থামলো। জর্জিয়ান স্থন্দরীরা অজস্র পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে অভ্যর্থনা করলো, শত শত কণ্ঠে ভারতের জয়ধ্বনি। "স্বাধীন ভারত শান্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হোক।" সুদূর বিদেশে আমরা জননী জন্মভূমির স্বাধীনতার গৌরব ঘোষণা করে বললাম, আমাদের জনসাধারণ ও নেতারা যুদ্ধের বিরোধী। শান্তিকামী স্বাধীন ভারত কোনো শক্তিশিবিরের লেজুড় হয়ে হিংসা ও হত্যার অভিযানে যাবে না।

সমুদ্রের ধারেই একটা বড় হোটেলে এসে উঠলাম। বারান্দা থেকে দেখি ছ'দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় সমুদ্র তীর বাঁধানো, পায়ে চলার রাস্তা এবং বাগান। তারপর বড় রাস্তা। বারিধির বিস্তারে ঘন্ অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের নীলাঞ্জন ছায়া গাঢ়তর। তীরে শুভ্র সমুন্নত সৌধমালা। সৌন্দর্যবোধ ও স্থরুচি মিলিতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে চারিদিকে।

এখানকার 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' দেখবার মত। ১৮৮০ সালে এর পত্তন হয়, নানাদেশের গাছপালা ফল ও ফুলগাছের সমাবেশ। আমাদের শিবপুর বাগানের অন্ততঃ তিনগুণ, সংগ্রহও অনেক বেশী। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এবং তাঁদের ছাত্রদের একটি বৃহৎ গবেষণাগার রয়েছে। উদ্যানে প্রবেশ পথের পরেই কলাগাছের ঝাড়, ফিকে সবুজ রংএর দীর্ঘপাতাগুলি বাতাসে তুলছে। শুনলাম এখানে কলাগাছ যত্ন করলে হয়, কিন্তু তাতে ফল ধরে না, কেবল

পাতারই বাহার। বহু সুমিষ্ট ফলের দেশে কলাগাছ কেন নিষ্ফলা হ'ল, বুঝে উঠতে পারলাম না।

একটা পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা চূড়ায় উঠে গেলাম। শঙ্খধবল বিশ্রামাগার, চারদিকে কেয়ারী করা বাগান। ধনী ও অভিজাতদের বিলাসভবন নয়, নবজাগ্রত জনসাধারণের আনন্দ নিকেতন। এখান থেকে সমুদ্র-মেখলা সুকুমী নগরী দেখায় সবুজ ফ্রেমে আঁটা ছবির মত।

সকালে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। পঞ্চাশ মাইল রাস্তা, পাহাড়ের ওপর উঠছি যেন দেরাদুন থেকে মুসৌরী অথবা কাঠগুদাম থেকে নাইনীতাল। পাহাড়ের গায়ে পাইন বন খাড়া উঠে গেছে, ঝরণা গলে গড়িয়ে পড়ছে কলহাস্যে। দেখতে দেখতে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গেলাম। পর্বত শৃঙ্গবেষ্টিত রিৎসা হ্রদ, অতলস্পর্শ নীল জল থৈ থৈ করছে। লরী ও বাসে এসেছে সমবায় কৃষিক্ষেত্র থেকে কারখানা থেকে তরুণ তরুণীরা। মোটর বোটে হ্রদে বেড়াচ্ছে অথবা দাঁড়টানা নৌকা নিয়ে বাইচ খেলছে। হ্রদের তীরে মদ্য ও খাদ্যের দোকান। লক্ষ্য করে দেখেছি এরা কড়া মদ খায় না। আঙ্গুরের রসে তৈরী রক্তিম সুরভি সুরাই এদের প্রিয়। প্রাচীন আর্যরা যে ঘরে তৈরী আসব পান করতেন, সে ধারা এরা বজায় রেখেছে।

সুকুমীর চারপাশে অনেকগুলি ছোট বড় স্বাস্থ্যনিবাস ও আরোগ্যশালা দেখলাম। এগুলি বিভিন্ন রিপাবলিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের তৈরী। এর মধ্যে গাগরীর স্বাস্থ্যনিবাসটাই বৃহৎ।

সর্বত্রই স্বাস্থ্যনিবাস ও আরোগ্যশালা পাশাপাশি রয়েছে। স্বাস্থ্যনিবাসে শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবীরা বিশ্রাম ও ভ্রমণের আনন্দে চিত্তবিনোদন করে আর আরোগ্যশালায় থাকে রোগীরা, বিনাব্যয়ে আহার শুশ্রূষা চিকিৎসার ব্যবস্থা। জলচিকিৎসার নানা রকম ধারাযন্ত্র প্রত্যেকটিতে আছে। এগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। গ্রীষ্মকালে নানা প্রান্ত থেকে শত শত নরনারী এসেছে স্বাস্থ্যনিবাসে। এর আরাম যত্ন আসবাবপত্র, আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা চিন্তাই করতে পারে না, ধনীদের পক্ষেও দুর্লভ।

যারা উদয়াস্ত খেটে উদরান্ন সংগ্রহ করে বা কারখানায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে কায়ক্লেশে বাঁচবার মত মজুরী পায়,তাদের বিশ্রাম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যলাভের অধিকার আছে, আমাদের দেশে এ কল্পনা করাই কঠিন। এদের শিক্ষাবিধির মত স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের ব্যবস্থাও সর্বব্যাপী। অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অচিকিৎসায় কেউ মারা না যায়, এ সম্বন্ধে সোবিয়েত সরকার সতর্ক ও সজাগ। আমাদের রাজধানীর হাসপাতালের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেয়া রুগ্ন নরনারীর হতাশা-মলিন মুখগুলো মনে পড়লো, মনে পড়লো হতদরিদ্র দেশের চৌষট্টি টাকা দাবী করা ডাক্তারদের প্রসন্ন মুখচ্ছবি। লোকাকীর্ণ বস্তীর বদ্ধ ঘরে যক্ষ্মায় ভুগে কত লোক মরছে, আর দশ জনের মরবার ব্যবস্থা রেখে যাচ্ছে, কে তার হিসেব নেয়। আমাদের দেশে বিরল সংখ্যক দাতব্যচিকিৎসালয় অবশ্য আছে, গভর্নমেণ্ট এবং দয়ালু ধনীদের খয়রাতি পাইকারী মিক্‌চার না খেয়ে কেউ যাতে না মরে, সে

ব্যবস্থা আমরা করেছি বই কি। এখানে সর্বত্র লোকসাধারণ বিনা-মূল্যে ওষুধ আর বিনা-ভিজিটে ডাক্তার পায়, আর পেয়েছে এই সব রাজপ্রাসাদ তুল্য আরোগ্যশালা। এগুলি কি কেবল আরোগ্যশালা? এ যে মানুষের বৃহৎ মিলনের আনন্দ সম্মেলন। জার সাম্রাজ্যে যারা ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিচয়হীন, বিচিত্র জাতের মানুষের পরস্পরের মেলামেশার কোন সুযোগ ছিল না। আজ উক্রেনের খনি মজুরের পাশের ঘরে বাস করছে, মোঙ্গলিয়ার ইস্কুল-মাস্টার।

বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র অক্টোপাসের মত আমাদের যেমন ভাবে পিষে হাড়গোড় ভেঙ্গে পঙ্গু করে ফেলে রেখে গেছে, জারের আমলে এদেরও ছিল সেই দশা। কিন্তু এরা প্রাচীন ব্যবস্থা জড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পেরেছিল বলেই আত্মকর্তৃত্বের জাদুমন্ত্রে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। আর আমরা প্রাচীন শাসনযন্ত্রের ওপর ত্রিসিংহ মূর্তির ছাপ দিয়ে, সেই আমলা-শ্রেণীর ওপর চালাবার ভার দিয়েছি, যারা আত্মসম্মান খুইয়ে বিদেশীর দাসত্ব করেছে। যে নিজেই অশ্রদ্ধেয়, সে স্বজাতিকে শ্রদ্ধা করার মত চরিত্রবল কোথায় পাবে! এখানে সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ইংরাজ আমলের 'ল' এণ্ড অর্ডারের' মানুষ পেষা জাঁতাকলটা ভারত সমুদ্রে বিসর্জন না দিতে পারলে, বহুকাল ধরে অপমানিত অবজ্ঞাত জনসাধারণের কল্যাণ নেই। খুবই দুঃসাধ্য, অন্য কোন পথও দেখিনে।

আঠার

জুগদিদি। এরা বলে গ্রাম, কিন্তু এসে দেখি সহরেরও বাড়া। স্থকুমী থেকে ট্রেনে আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। বৃষ্টি মাথায় করে পান্থশালায় এলাম: প্রশস্ত রাস্তা বিত্যুতালোকে উদ্ভাসিত। সকালে দেখি, সম্মুখে বাগান অন্যপাশে বড় বড় দোকান— দলে দলে কৃষকরমণী এসেছে সওদা করতে এবং বেচবে বলে কেউ কাঁকালে করে এনেছে শুকর-ছানা। দেখে ভ্রম হয়, যেন কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ার সৌখিন দোকানে মেম-সাহেবেরা বাজার করতে বেরিয়েছেন। আমার সঙ্গীরা তখনও ঘুমুচ্ছেন; একাই বেরিয়ে পড়লাম। এখানকার মেয়েরা মস্কৌএর মত নয়, পোষাক ও প্রসাধনে পারিপাট্য আছে, অলঙ্কারও প্রচুর। সম্মুখে ভীড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ঘড়ীর দোকান, ঘড়ী মেরামতের খদ্দেরদের ভীড়। হাত ঘড়ীর চল এখন বিশ্বব্যাপী। এখানেও তরুণ তরুণীদের হাতে সোনার বক্‌লস দেয়া হাতঘড়ীর ছড়াছড়ি। পথে অনেকে হেসে অভিবাদন করে, আমিও হেসে নমস্কার করি, কথা বলবার উপায় নেই। বাগানের বেঞ্চে এসে বসেছি, পাশে একজন আরাম করে পাইপ টানছেন। ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ সুরু করলেন। আমি যত বলি, ইণ্ডিস্কী, হিন্দী, তিনি তা কানেই তোলেন না। নিজের বক্তব্য অনর্গল বলে যাচ্ছেন। এমন সময় আমাদের সঙ্গী

আনাতোলি এসে হাজির, নিষ্কৃতি পেলাম। শুনলাম, কমরেড তাঁদের গ্রামের সমৃদ্ধি কি ভাবে চা-বাগানের দৌলতে বেড়ে গেছে, তারই গল্প শোনাচ্ছিলেন।

দুটো চা-বাগান ও একটা চা তৈরীর কারখানা দেখলাম। আমাদের দেশের তরাই-এর চা-বাগানগুলোর মতই। কারখানা অর্থাৎ কাঁচা চায়ের পাতা নানারকম প্রণালীর মধ্য দিয়ে শুকিয়ে যে ভাবে চা হয়, তাও আমাদের দেখান হ'ল। এমন কারখানা আমাদের দেশেও আছে, কেবল নেই কুলী ও কুলীবস্তী। চা-বাগানের কারখানার চারদিকে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় কর্মীরা বাস করে। ছোট ছোট ব্যক্তিগত পারিবারিক বাড়ীও আছে। এছাড়া ক্লাব নাচঘর থিয়েটার শিশু পালনাগার কিণ্ডারগার্টেন রয়েছে। চায়ের পাতা মেয়েরাই তোলে। একটি কারখানায় থান ইটের মত চা তৈরী হয়, এগুলি মঙ্গোলিয়া কাজাকস্তান ও সাইবেরিয়ায় চালান যায়।

জুগদিদির চারদিকে সমবায় কৃষিক্ষেত্র। এই কৃষির দৌলতেই গ্রাম শহর হয়েছে। এদের গ্রাম্য ম্যুজিয়ম দেখে বিস্মিত হলাম। প্রস্তরযুগ থেকে আধুনিক যুগের কত ঐতিহাসিক নিদর্শন এরা সংগ্রহ করেছে। জর্জিয়ান কুটির শিল্প ও চিত্রকলার সংগ্রহ প্রচুর। একটা কক্ষে স্থানীয় সামন্তরাজার সংগৃহীত বিলাসসামগ্রী ও তৈজসপত্র। ইনি প্যারিসে নেপোলিয়নের ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল কিনেছিলেন, তাও দেখলাম এরা যত্ন করেই রেখেছে। এখানে লোকে দেশের শিল্প খনিজসম্পদ সংস্কৃতি ও চারুকলার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে।

একজায়গায় প্রাচীন আমলের অভিজাতদের মূল্যবান চীনে মাটির বাসন, স্ফটিক পানপাত্র থরে থরে সাজানো তার পাশেই কৃষকদের পোড়া মাটির মলিন পাত্রগুলি। লোকে এক নজরেই পুরনো দিন আর হাল আমলের তফাৎটা বুঝতে পারে।

ম্যুজিয়মের পাশেই খেলার মাঠ। একধারে তিনতলা স্টাডিয়াম, প্রায় ১৫।২০ হাজার লোক বসতে পারে। গ্রামেও এমনটা সম্ভব হয়েছে! এখানে ফুটবল খেলা হ'ল। তারপর সুরু হ'ল ককেসিয়ানদের জাতীয় ক্রীড়া ঘোড় দৌড়। জাতীয় পোষাকে সজ্জিত পুরুষ নারী ও কিশোর বালকরা ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক রকম দুঃসাহসিক খেলা দেখালো। শত্রুর ব্যূহে প্রবেশ করে ভল্ল নিক্ষেপ এবং পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন; দর্শকগণ করতালি দিয়ে উৎসাহিত করতে লাগলো। প্রায় পঞ্চাশটি দ্রুত ধাবমান অশ্বারোহীর পুরোভাগে পতাকাবাহী নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধ, শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রু বাতাসে উড়ছে। দেখে অবাক হলাম। এ দেশের নরনারী দীর্ঘজীবী হয়, আশী নব্বুই বছরেও এরা যুবার মত কর্মক্ষম।

বেলা পড়ে আসছে, আমরা একটা বৃহৎ সমবায় কৃষিক্ষেত্রে গেলাম, নাম 'বেরিয়া খোলকোজ'। বেরিয়া বলশেভিক আন্দোলনে স্তালিনের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। ইনি জর্জিয়ার একজন মুখ্য নেতা, বর্তমানে সোবিয়েত রাশিয়ার অন্যতম মন্ত্রী।

ডিরেক্টর কৃষিক্ষেত্রের যে পরিচয় দিলেন, তা মোটামুটি এই — ১৯৩০ সালে ৫৭টি পরিবার এবং ১৬৯ হাজার রুবল সম্পত্তি নিয়ে এই কৃষিক্ষেত্রের পত্তন হয়। ১৯৫১ সালে ২৭০টি পরিবার এবং

মোট সম্পত্তির মূল্য ১১০ লক্ষ ৬ হাজার রুবল। পূর্বে এ অঞ্চলে কেবল ভুট্টার চাষ হত। সোবিয়েত কৃষি-বিজ্ঞানীদের সহায়তায় চা ও ফলের চাষ স্থুরু হয়। মোট জমি ১৫৮০ হেক্টর (১ হেক্টর ২'৪৭ একর)। চা আঙ্গুর ফল তরিতরকারী এবং ভুট্টার চাষ হয়। এ ছাড়া সমবায়ের এবং ব্যক্তিগত পশু পাখী পালন আছে। সমবায়ের দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ৮৭৪।

১৯৫০ সালে মোট আয় হয়েছে নয় হাজার লক্ষ রুবল। দৈনিক মাথাপিছু মজুরী ৪২ রুবল। বেতন বোনাস নিয়ে কৃষকেরা পেয়েছে ৫ হাজার লক্ষ ৭৯ হাজার রুবল। সরকারী ট্যাক্স ২ লক্ষ ৫০ হাজার রুবল দিয়ে বাকী অর্থ হাসপাতাল স্কুল ক্লাবের জন্য ব্যয় হচ্ছে। সমবায়ের বিশটি ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, তাদের খরচ দেয়া হয়। বেতন ভাতার নগদ অর্থ ছাড়া প্রত্যেক পরিবার বছরে দু'টন শস্য পায়। গৃহপালিত পশু ও ফল তরিতরকারীর বাগান থেকেও বাড়তি আয় আছে। এই কৃষিক্ষেত্রে ৪০ জন 'স্যোসালিস্ট হিরো' এবং ২১ জন সম্মানিত পদকধারী রয়েছে।

আমরা চারদিক ঘুরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কৃষকদের বাড়ীঘর আসবাবপত্র দেখলাম। স্বচ্ছলতা ও সাফল্যের ছাপ সর্বত্র। একজন বৃদ্ধ কৃষক বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে, আগের দিনের গল্প বললেন। বলশেভিকরা যখন প্রস্তাব করলো, এ ভাবে চলবে না, সমবায় কৃষি-ক্ষেত্র গঠন করতে হবে, উত্তেজিত আলোচনায় গ্রাম ভরে উঠলো। নিজের জমি না হলে কি কেউ মন দিয়ে চায করবে,

সব পয়মাল হয়ে যাবে। সকলে মিলে সব জমির মালিক হবে, এমন অসম্ভব কথা কে কবে শুনেছে? যাদের জমি নেই, ভাগচাষী, মালিক হওয়ার লোভে তারা তো রাজী হয়ে গেল, ছোট ছোট কৃষকরাও নিম রাজী, কিন্তু কুলাকরা (জোতদার) কিছুতেই রাজী হয় না।

সভা ডাকা হ'ল। তরুণ বলশেভিকরা সমবায় কৃষিক্ষেত্র ও যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক চাষের ভাবী সমৃদ্ধি বর্ণনা করলো। কলে চাষ ফসল কাটা ফসল ঝাড়াই হবে, এমন আজগুবী কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বক্তৃতা শেষ হবার পর একজন প্রবীণ কৃষক বলতে লাগলেন, তোমরা সহুরে কেতাব পড়া, আমাদের মনের ভাব ও অবস্থা বোঝ না। আমি এখনও মরিনি, এর মধ্যেই দু'ছেলে জমি ভাগ বাটোয়ার সলা পরামর্শ করছে; আমার দুই বেটার বউ আরো উৎসাহী। গরু ঘোড়া হাঁস মুরগী তারা ভাগ করে ফেলেছে, ভেড়া হ'ল তিনটি। কি ভাবে ভাগ করা যায়! ছোট বউ বলে একটা ভেড়া কশাই-এর দোকানে বেচে দিয়ে টাকাটা ভাগ করে নিলেই হবে। যেখানে এক মায়ের পেটের দু'ভাই একত্র মিলে মিশে চাষ করতে চায় না, সেখানে তোমরা গ্রামশুদ্ধ লোককে একসঙ্গে চাষ করাতে চাও!

কিন্তু তাও হ'ল ধীরে ধীরে। অল্প জমি আর কয়েক ঘর কৃষক নিয়ে কাজ আরম্ভ হ'ল। এলো কলের লাঙ্গল, চাষের নূতন পদ্ধতি ও ফলন দেখে ক্রমে লোকের বিশ্বাস হ'ল বলশেভিকরা ভাল কথাই বলেছে। কৃষিকাজে আদিম ব্যবস্থা

অতিক্রম করে আমরা যন্ত্রযুগে এসেছি অনেক অবুদ্ধির খেসারত দিয়ে। আজ আমার বাড়ী দেখছো, এখানে ছিল আমার বাপ-দাদার মাটির কুঁড়ে, সেই অন্ধকূপে ভেড়া-ছাগলের সঙ্গে শুয়ে আমার শৈশব কেটেছে। এখন ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে, ক্লাবে গান গায়, রঙ্গীন পোষাক পরে নাচে, আমার নাতনী তিবলিসিতে কৃষি-বিজ্ঞান কলেজে পড়ছে। প্রাচীন কালের দুঃখ দারিদ্র্য ও আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলতে বলতে তিনি মুখর হয়ে উঠলেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি আপনাদের মধ্যে কলহ হয় না ? কেউ যদি কাজ ফাঁকী দেয় তার কি ব্যবস্থা ?

· বৃদ্ধ বললেন, মতভেদ ঘটে বৈকি। কাজ নিয়ে নয়, কাজের পদ্ধতি নিয়ে। ওগুলো নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেয়া হয়, না মিটলে ডিরেক্টর মধ্যস্থ হয়ে যে মীমাংসা করেন তাই আমরা মেনে নেই। ফাঁকী দেওয়ার কথা ওঠে না, কেননা আমাদের কাজ একঘেঁয়ে নয়। যে অপারগ তার খাটুনী কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পাইন গাছ ঘেরা সবুজ ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত মাঠে বিরাট বিদায় ভোজ। চক্রাকারে আমাদের নিয়ে দেড়শ' নরনারী বসলেন, পাঁচশ' লোক খেতে পারে এমন মাছ মাংস রুটি পনীর ও বিবিধ পিষ্টক। সুমিষ্ট সুরার ছড়াছড়ি। গরুর শিংএর বৃহৎ শিঙ্গায় মদ্যপান। ভোজন সভার কর্তা 'তামাদা' তিন বোতল মদ শিঙ্গায় ঢেলে এক চুমুকে পানপাত্র নিঃশেষ করলেন। আমি তো দেখে শিবনেত্র। অতিথিদের জন্যও ঐ ব্যবস্থা। অপারগতা জানিয়ে নিষ্কৃতি পেলাম।

জর্জিয়ান যুবকযুবতীরা সুসজ্জিত হয়ে নৃত্যগীত সুরু করলো। বাদ্য-যন্ত্র তাল সুর ও সঙ্গীতের মুর্চ্ছনায় ভারতীয় আভাস আছে। প্রেয়সী নারীর চিত্তজয় করতে তরবারী আস্ফালন করে নৃত্যের বলিষ্ঠ সুষমা ভাল লাগলো। দীর্ঘাঙ্গী গৌরবর্ণা সুগঠিত দেহ শুভ্রবসনা তরুণীদের সমবেত সঙ্গীত ও লোকনৃত্য নয়নময় হয়ে দেখলাম। জীবন্ত জাতির প্রাণের প্রাচুর্য এদের সারা অঙ্গে উচ্ছলিত, পদক্ষেপের দৃঢ়ভঙ্গিতে সচল শক্তির গতিচ্ছন্দ লীলায়িত হয়ে উঠছে। সেই অপরূপ সন্ধ্যায় হাসি আনন্দে তন্ময় হয়ে আছি, এমন সময় কমরেড অকসানা দেবীর পরিচিত আহ্বান, পাশলি পাশলি, বিদায় নেবার সময় হয়েছে।

উনিশ

লেখক সংঙ্ঘ ও নাগরিকদের বিদায় ভোজ রাত্রি তিনটেয় শেষ হ'ল। শেষরাত্রেই আমরা তিবলিসি থেকে বিমানে যাত্রা করলাম। ২৪শে জুলাই বিকেল ৪টায় মস্কোএ ফিরে এলাম। মুষলধারায় বৃষ্টি ও প্রখর বাতাস, তেমনি শীত। ন্যাশনাল হোটলের পরিচিত ঘরে প্রবেশ করে বাঁচলাম। চা খেতে খেতে জানালা দিয়ে দেখি বৃষ্টিধারা স্নাত গাছগুলি তুলছে, নীচের রাস্তায় ভূঁইচাপা ফুল ফুটছে। ধূসর আকাশের নীচে ক্রেমলীন প্রাসাদতুর্গ আপন অটলোন্নত মহিমায় দাঁড়িয়ে ধারাস্নান করছে। পথ জনহীন। বর্ষার জলধারায় প্লাবিত কলকাতার কথা মনে পড়লো। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, ইলিশ গুঁড়ি বৃষ্টি হলেই মধ্য কলকাতায় কোমর জল। আপিস ফেরৎ বাবুর দল কলেজের ছাত্র ইতর ভদ্র সকলেই গোপাল-কাছা হয়ে জুতো জোড়া কাঁধে তুলে মন্থর-পদে চলছে। অর্ধশতাব্দী দেখছি, কারো মুখে নালিশ নেই। যুবা বয়সে বিদ্যাধরী নদীর মরণ দশা নিয়ে খবরের কাগজে বিলাপ করেছি। কিন্তু কিছুই হয় নি, হ'ল না। ইঞ্জিনিয়রিং বিদ্যার পরাকাষ্ঠার দিনেও সহরের বর্ষার জল নিকাশের ব্যবস্থা হয় না। কেন হয় না? আমরা সহ্য করি বলেই হয় না। আমরা মুখ বুঁজে কর্পোরেশনের ট্যাক্স গুণি। দাবী দাওয়া নেই। মনে আছে

মেয়র হয়ে ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, শ্যামবাজারের সঙ্গে চৌরঙ্গী পাড়ার কোন পার্থক্য রাখবো না। কিন্তু পার্থক্য রয়ে গেছে। কর্তাদের ভাবিয়ে না তুলতে পারলে তারা ভাববেন কেন? তাই চৌরঙ্গীর সাহেব পাড়ার রাস্তা খোয়া বের করা নয়, দুপাশে ফুলবাগান পাতাবাহার, উদ্যানগুলি সুরচিত ও সুরক্ষিত। আর আমাদের পাড়ার রাস্তা কতকগুলো ছোটবড় গর্তের যোগ ফল হয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, মা বাপ মরা অনাথের মত। আমরা সহ্য করি কেন না আমাদের বুদ্ধি অলস, আত্মকর্তৃত্বের অধিকার যে মানুষের অধিকার পুঁথির এই তত্বটা আমাদের মগজে তর্কবুদ্ধি শানাবার চর্মই রয়ে গেল, আত্মরক্ষার বর্ম হল না। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরবশতার পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। নানা দুঃখকে যারা দৈবের মার বলে নিরুপায় ভীরুতায় সয়ে যায়, তাদের মানসিক দাসত্বের গ্রন্থী না খুললে কোন দুঃখেরই প্রতিকার সচেষ্ট হয়ে উঠবে না।

ইয়োরোপের ইতিহাসে অনেক রক্তারক্তির মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। তার পরিপূর্ণ প্রবল মূর্তি রাশিয়ায় এসে প্রত্যক্ষ করেছি। আচার বিচার বিধি বিধানে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা মানুষ ধর্ম-মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে অশ্রদ্ধা করতো, দাস তৈরীর সেই পাকা কারখানাটা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে বলেই যুক্তিহীন ও যুক্তি-বিরুদ্ধ প্রথার বন্ধন থেকে এরা মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির আনন্দ ও বিস্তার এদের সমাজজীবনে দীপ্যমান। এরা বাইরের কোন অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা পরিচালিত, বিদ্বেষে অন্ধ ছাড়া এমন কথা কেউ বলবে না।

এবারে মস্কৌএ এসে বিখ্যাত স্তালিন অটোমোবাইল ফ্যাক্টরী দেখলাম। বহুবিভাগে বিভক্ত বিশাল কারখানা। এর তিন প্রধান বিভাগ থেকে প্রতি সাড়ে তিন মিনিটে একখানা করে বাস্ মোটরগাড়ী ও লরী বেরিয়ে আসছে। বিভিন্ন বিভাগে তৈরী অংশগুলি কেমন করে স্তরে স্তরে জোড়া দেয়া হচ্ছে তা ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেক সময় লাগলো। মেয়ে পুরুষ দুইরকম শ্রমিকই আছে, প্রজ্জ্বলিত চুল্লী বা হাঁপর ও হাতুড়ী পেটার কাজে মেয়েদের নিয়োগ করা হয় না। আমরা শ্রমিকদের খাটুনীর পরিমাণ ও সময় নিয়ে প্রশ্ন করলাম। একজন রসিক শ্রমিক বললে, ছোট গোলামকে খাটাবার তরে এখানে বড় গোলাম চাবুক উঁচিয়ে নেই। ট্রেড্ ইউনিয়নের বাঁধা নিয়মে আমরা কাজ করি। কাজ চলেছে ঘড়ির কাঁটার মত।

এই কারখানার হাউস অফ কালচার বা সংস্কৃতি-ভবন একটা বৃহৎ ব্যাপার। বিরাট প্রাসাদ, বড় বড় হলে খেলাধূলা ছবি আঁকা বই বাঁধাই নানাবিধ হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা। শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরা এখানে শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদ দুই-ই পাচ্ছে। একটা বড় হলে ঢুকে দেখি ছেলেমেয়েরা নানারকম খেলনা নিয়ে মেতে আছে, এ দৃশ্য কত সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছোটদের ও বড়দের দুটো সিনেমা হল ও থিয়েটার রঙ্গমঞ্চ, তারপর লাইব্রেরী। শ্রমিকরা টেকনোলজী অর্থাৎ যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা করে উন্নত হতে পারে তারও দরাজ ব্যবস্থা। এদেশে এসে যতগুলো কারখানা দেখেছি, সর্বত্রই এ সব আছে। আর আছে শিশুপালনাগার

কিণ্ডারগার্টেন প্রসূতিভবন চিকিৎসালয়। কৃষক শ্রমিকের রাষ্ট্রে এ হবে না তো আর কোথায় হবে? এখন দেখে আর অবাক হইনে!

নিখিল রাশিয়ার ট্রেড্ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আপিস। কলকাতার লাল দীঘির দপ্তরখানার প্রায় তিনগুন। সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকদের গঠন কাজের ধারা নিয়ন্ত্রিত করবার স্নায়ুকেন্দ্র। আমরা একটা বড় হলঘরে সমবেত হলাম। চার পাঁচ জন বয়স্ক শ্রমিকনেতা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল ছয়যট্টি প্রকার বিভিন্ন কারখানা শিল্প দপ্তরখানা শিক্ষালয়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত। শ্রমিক শিক্ষক ও কেরানীর মোট সংখ্যা তিনকোটি ৯০ লক্ষ। এর মধ্যে তিন কোটি ট্রেড্ ইউনিয়নের সদস্য। শাখা ও আঞ্চলিক শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির বছরে দুইবার নির্বাচন হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি যন্ত্রের উন্নতি, শারিরীক শ্রম লাঘব, শ্রমিকদের মর্যাদা, শিক্ষা স্বাস্থ্য সাংস্কৃতিক উন্নতি প্রভৃতি বিবেচনা করে সংস্কারের প্রস্তাব করেন, সর্বজনের সমর্থনে তা অনুমোদিত হলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান তা গ্রহণ করেন এবং গভর্নমেণ্টও সেইভাবে আইন সংশোধন করেন।

সদস্যরা উপার্জনের শতকরা একভাগ মাসিক চাঁদা দেয়। এ ছাড়া কারখানা ও গভর্নমেণ্টও নির্দিষ্ট হারে অর্থ দেন। এই অর্থে এরা বর্তমানে ৯ হাজার ৫ শ' সংস্কৃতি ভবন

ক্লাব ও শিক্ষালয়, ৯০ হাজার ছোট বড় রেড ক্লাব এবং ৮ হাজার ৫শত লাইব্রেরী ও পাঠাগার (বই ৫ কোটি) পরিচালনা করেন। শ্রমিকরা বার্ধক্যে বা রোগে অকর্মণ্য হয়ে পড়লে স্যোশাল ইনসিওরেন্স ভাণ্ডার থেকে তাদের ভরণ-পোষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রেড্ ইউনিয়ন বা শ্রমিকদের কর্তব্য ও অধিকার অতি নির্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ।

১। যারা কলকারখানা দপ্তরখানা কিম্বা উচ্চতম বিদ্যালয়ে অথবা কারিগরী ও বিশেষ বৃত্তির শিক্ষা লাভ করছে সেই সব সোবিয়েত রাষ্ট্রের নাগরিক মাত্রই ট্রেড্ ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবে ;

২। ট্রেড্ ইউনিয়নের সদস্যদের এই সব অধিকার আছে ;

(ক) ইউনিয়নের সাধারণ সভায় যোগদান ;

(খ) ইউনিয়নের সংস্থা সম্মেলন এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া ;

(গ) ইউনিয়নের কাজের উন্নতির জন্য প্রস্তাবাদি উত্থাপন করা ;

(ঘ) ট্রেড্ ইউনিয়নের সভা সমিতি কংগ্রেস এবং সংবাদপত্রে স্থানীয় অথবা উচ্চতর ইউনিয়নগুলির তাদের কর্মকর্তাদের সমালোচনা করা, প্রশ্ন করা বিবৃতি দেওয়া অথবা অভিযোগ উপস্থিত করা ;

(ঙ) যে পরিচালকবর্গ সম্মিলিত চুক্তি ভঙ্গের অথবা প্রচলিত শ্রমিক আইন, সোশ্যাল ইনসিওরেন্স সাংস্কৃতিক ও

জনকল্যাণের বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী, সেখানে ট্রেড্ ইউনিয়নের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করা ;

(চ) কারো কাজকর্ম ও আচরণ সম্বন্ধে যখন ইউনিয়ন কোন মন্তব্য প্রকাশ করে তখন সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিতি দাবী করা ;

৩। প্রত্যেক ইউনিয়ন সদস্যের কর্তব্য ;

(ক) পৌর ও শ্রমিক শৃঙ্খলা সর্বপ্রযত্নে মেনে চলা ;

(খ) সোবিয়েত পদ্ধতির অটল ভিত্তি জনসাধারণ ও সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি, দেশের ঐশ্বর্য ও শক্তির উৎস শ্রমজীবীদের সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির প্রাণশক্তির উৎস নিরাপদ রাখা ও রক্ষা করা :

(গ) যোগ্যতার সমুন্নতি এবং স্ববৃত্তি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করা ;

(ঘ) স্ব স্ব শ্রমিকসঙ্ঘের নিয়মতন্ত্র মেনে চলা এবং নিয়মিতভাবে চাঁদা দেওয়া ;

৪। প্রত্যেক সদস্যই নিম্নলিখিত সুবিধেগুলি পাবার অধিকারী ;

(ক) যারা সদস্য নয়, তাদের থেকেও বেশী পরিমাণে রাষ্ট্রের সোশ্যাল ইনসিওরেন্স ভাণ্ডার থেকে সদস্যরা অর্থ সাহায্য পাবে। এই সাহায্য পাওয়া অবশ্য রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের অধীন ;

(খ) বিশ্রামাগার, সেনাটোরিয়াম স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতিতে যাওয়ার ছাড়পত্র বিতরণে এবং ছেলেমেয়েদের শিশুপালনাগার

কিণ্ডারগার্টেন এবং তরুণ পাইওনিয়র্স শিবিরে পাঠাবার অগ্রাধিকার ;

(গ) ট্রেড্ ইউনিয়ন ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন মত সাহায্য ;

(ঘ) শ্রমিকসঙ্ঘ থেকে বিনামূল্যে আইনের পরামর্শ ;

(ঙ) প্রত্যেক সদস্যের পরিবারবর্গ নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলার প্রতিষ্ঠানে যোগদান ;

(চ) স্ব স্ব শ্রমিকসঙ্ঘের পারস্পরিক সহায়ক সমিতির সদস্য হবার।

বলা বাহুল্য শ্রমিকদের কর্তব্য ও অধিকারের এই ধারাগুলি আমি ওদের মুদ্রিত নিয়মতন্ত্র থেকে বলছি। এর মধ্যে দুর্লভ বা দুরূহ কিছু নেই। কিন্তু এই নিয়মের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আত্মীয়তা নিবিড় হয়ে উঠেছে এইটে চোখে দেখে এলাম। পশ্চিমী সভ্যতার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বুলি তোতা-পাখীর মত আমরাও কপচাই কিন্তু তলিয়ে দেখিনে, ঐ বুলির আড়ালে দানবীয় লোভ মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে কি গভীর অনৈক্যে কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের দেশে যা দেখি তা কেবল ধনী নির্ধনের ভেদ নয়, জাতিভেদ ধর্মভেদ তো আছেই, তার উপর শিক্ষা বিদেশী ভাষায় হওয়ায় শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং "ছোটলোকের" মধ্যে সামাজিক আত্মীয়তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারের এই চেহারা কত কুৎসিত। ছলে বলে কৌশলে আমি বড় হব, আমি ভোগ করবো, মানুষকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে অপমান ও বঞ্চনা করা সমাজ

জীবনে কত বিচিত্র আকারে প্রকাশিত। সোবিয়েত রাশিয়ার মানুষ এই স্তর অতিক্রম করার কঠিন পণ করেছে। ওদের শ্রমিক-সঙ্ঘের গঠন ও পরিচালনা প্রণালী পরস্পরের প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা।

বিশ

৩০শে জুলাই অপরাহ্নে তাসকেণ্টে আসা গেল। নগর উপকণ্ঠে বাগান ঘেরা একটি বাংলোয় এসে উঠলাম। আগের রাতে মস্কোএ লেখকসংঙ্ঘের অভ্যর্থনা সভায় বক্তৃতা ও নৃত্য-গীতের পালা মিটতে রাত্রি হু'টো হয়েছিল, তারপর আড়াই হাজার মাইল বিমানে পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিকেল বেলা, আমাদের দেশের মতই গরম। স্নান আহার শেষ করে বিশ্রাম। অনেকদিন পর মশলা সহ নদীর মাছের সুস্বাদু ঝোল সহযোগে পোলাও খাওয়া গেল।

মধ্য 'এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে উজবেকিস্তান সর্ববৃহৎ। উজবেক জাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ, জনসংখ্যা ৬৬ লক্ষ। তাসকেণ্টের অধিবাসীই সাড়ে সাত লাখ। অন্যান্য সব জাতের মতই এরাও মিশ্র জাতি। এদের ধমনীতে মোঙ্গল ও তাতার রক্ত আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই জাতের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী তিমুরের অভ্যুত্থান। দিল্লী থেকে মস্কো এর নিষ্ঠুর অভিযানে কম্পান্বিত হয়েছিল। এখান থেকেই তিমুরের বংশধর বলে কথিত বাবর ফারগানা থেকে দিল্লীতে এসে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমরখন্দের সঙ্গে হিন্দুস্থানের যোগাযোগ কয়েক শতাব্দীর। দার্শনিক আলবেরুনী,

জ্যোতির্বিজ্ঞানী উলুক বেগ, কবি আলী শের নাভাই-এর খ্যাতি একদিন সমগ্র প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ যে ভাবে সমগ্র প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, ঠিক সেই ভাবেই সাহসী রণনিপুণ পরিশ্রমী শিল্প ও চারুকলায় উন্নত উজবেকদের জাতীয় জীবনের ওপর অন্ধকার নেমে এলো। জার সাম্রাজ্যবাদ কবলিত উজবেকজাতি মোল্লাতন্ত্র ও জারতন্ত্রের শোষণ শাসনে দরিদ্র কৃষক মজুর ও যাযাবরে পরিণত হ'ল। অক্টোবর বিপ্লব ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ১৯২৪-২৫ থেকে এক নূতন অভ্যুত্থান। সেদিন এরা আমাদের দেশের চেয়েও পিছিয়ে ছিল, শতকরা ৯৮ জন ছিল নিরক্ষর। রুক্ষ মরুভূমির কৃপণ মাটিতে মাথা খুঁড়ে যা পেত তার অধিকাংশই সেখ ও বেগের (অভিজাত) দল নানা ছলে কেড়ে নিত। কিন্তু এক জায়গায় ওদের সঙ্গে আমাদের মিল ছিল। সে হ'ল ধর্ম সম্প্রদায় নিয়ে কলহ। জারের আমলে ওরা আমাদের মতই ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মাথা ফাটাফাটি করতো। সাম্রাজ্যরক্ষার এই ভেদনীতির বিষাক্ত শিকড় আত্ম-সম্বিতহীন সমাজকে টুক্‌রো টুক্‌রো করেও একত্র বেঁধে রাখে, যেমন বট অশ্বথের শিকড় পুরাতন পরিত্যক্ত মন্দিরের শ্রীহীন বিকৃত ঠাটকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

এর দুঃখ ও অপমান আমরা জানি। এই ভেদনীতির আর একরূপ 'ল' এণ্ড ওর্ডার' অর্থাৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা! ইংরাজ শাসকেরা জাঁক করে বলতেন, কেবল কি হিন্দু মুসলমান

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতায়ও তোমরা পরস্পর কত বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন, আমরা তোমাদের পিনালকোডের আওতায় ঐক্য দিয়েছি। আমরা চলে গেলে তোমরা কাটাকাটি করে মরবে। মারামারি মাথা ফাটাফাটিটা অনেক ইংরাজ পছন্দ করতেন না বটে, তবে রেষারেষিটা থাকুক এটা তারা চাইতেন। তাই ইংরাজ আমলে আমরা এক শাসন পেয়েছিলাম এক জাতীয়ত্ব পাইনি। এক ভারতীয় 'নেশন' রূপে গড়ে উঠ্‌বার বনিয়াদ ছিল, মাল মশলারও অভাব ছিল না; তবুও পরিণামে সাম্প্রদায়িক বিরোধটা ক্রমে বিচ্ছেদে পরিণত হয়ে ভারতের ইতিহাসে এক শোকাবহ পরিণতি লাভ করল, এবং আমরা তা স্বীকার করে নিলাম।

এখানে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসানের ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। বলশেভিক বিপ্লবীরা ক্ষমতা হাতে পাবার বহু পূর্বেই রাশিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি ও সম্প্রদায়-গুলির সমস্যা মীমাংসা করে রেখেছিল। এ ভার একদিন লেনিন স্তালিনকে দেন। স্তালিনের রচিত "মার্কসবাদ এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন" রাষ্ট্র বিজ্ঞানে তাঁর অবিস্মরণীয় দান। স্তালিনের এই মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতে ১৯১৭ সালেই নবগঠিত সোবিয়েত সরকার ঘোষণা করেছিলেন, (১) রাশিয়ার জনসাধারণের সকলের অধিকার সমান; (২) স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সকলের; (৩) জাতিগত ধর্মগত কোন বিশেষ সুবিধা ও বাধা বিলুপ্ত করা হ'ল;

(৪) সমস্ত সংখ্যালঘু জাতি বা গোষ্ঠীর আত্মোন্নতির স্বাধীনতা অবাধ।

অতএব যা ঘটলো, তা ক্রমোন্নতি নয়, বিভিন্ন শ্রেণী সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা নয়; একেবারে ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন অভিজাতশ্রেণী এবং রুশ শাসকশ্রেণী বাধা দিয়ে ছিল প্রচুর। কিন্তু বিপ্লবীরা ভড়কে গিয়ে তাদের সঙ্গে আপস করেনি। তারা শোষকশ্রেণীকে একহাতে উচ্ছেদ করেছে আর একহাতে শোষকশ্রেণীর উৎপত্তির কারণগুলি নির্মূল করে ফেলেছে।

নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর সমাজব্যবস্থা পত্তন করতে বেগ পেতে হয়েছে। অশিক্ষা ও ধর্মমূঢ়তায় এরা ছিল আচ্ছন্ন। নারীদের অবরোধ মুক্তি এবং শিক্ষাদানের সূচনায় মোল্লারা ক্ষেপে গিয়েছিল। তার অনেক কৌতুককর কাহিনী শুনলাম। বিপ্লবীরা রুশ বর্ণমালায় উজবেক কথ্যভাষায় পাঠ্য-পুস্তক ব্যাকরণ তৈরী করল, দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল লৌকিক শিক্ষায়তন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার বোধ জাগ্রত হ'ল। সম অধিকারভোগী বৃহৎ মানব পরিবার দানা বেঁধে উঠ্‌লো। নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য নিয়ে উজবেকীরা আজ সোবিয়েত রাষ্ট্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এখন উজবেকিস্তানে একজনও নিরক্ষর নেই। মেয়েরা 'পাঞ্জারা' (বোরখা) ফেলে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ

করছে। এদের নাগরিক জীবনে রুশ সংস্কৃতির দু'শো বছরের ছাপ সুস্পষ্ট। মেয়ে পুরুষ সকলেরই পোষাকে ইয়োরোপীয় ঢং। তবে পুরুষেরা আলখেল্লা ও টুপী ছাড়েনি, মেয়েরাও সোনারূপো ও মূল্যবান পাথরের ঝালর দেওয়া টুপী পরে, দু'পাশে লম্বা বেণী দুলিয়ে দেয়, চোখে দেয় কাজল ও সুর্মা, অলঙ্কারেরও প্রাচুর্য আছে।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে যে সব মেয়ে অন্তঃপুরে ছিল দাসী বাঁদি হয়ে কিম্বা কোন বেগের বহু পত্নীর অন্যতমা, নয়া সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার প্রসারে তাদের সহজ সচ্ছন্দ মুক্তি দেখলে চমক লাগে। জড়প্রথার দাসত্বে অভিভূত সনাতন প্রাচ্যের অবগুণ্ঠিত জীবনের এই অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ দেখতে পাওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্য। উজবেক মেয়েরা কলকারখানায় কাজ করছে, ট্রাম বাস চালাচ্ছে, সরকারী কার্যালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রঙ্গমঞ্চে সর্বত্র যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছে। কৃষিবিজ্ঞানী চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়র বৈজ্ঞানিক লেখিকা গায়িকা নর্তকীর সংখ্যা মেয়েদের মধ্যে কম নয়।

উজবেক রিপাবলিকের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট নারী। একদিন তাঁর দপ্তরখানায় আমাদের চা-পানের আমন্ত্রণ হ'ল। গিয়ে দেখি প্রতিনিধিস্থানীয়া কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন। শুনলাম সুপ্রীম সোবিয়েতের মহিলা সদস্য তেরজন, উজবেক পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্য একশ'জন। শাখা সোবিয়েত মণ্ডলীতে নারী সদস্য চৌদ্দ হাজার। এখানকার ৪৭ হাজার শিক্ষক অধ্যাপকের মধ্যে ১৯ হাজার নারী, মহিলা ডাক্তার চার শ'। মাত্র পঁচিশ বছরে

মধ্যযুগীয় বর্বর সামাজিক ব্যবস্থায় অধিকারবঞ্চিতা নারীরা চার-শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

গৃহকর্মের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে স্বামী পুত্র আত্মীয়বর্গের সেবা এবং অকল্যাণের ভয়ে বার ব্রত পালন দেবতার কাছে মানত করা এই নিয়ে যখন ছিল মেয়েদের জীবন, যখন পুরুষ রচিত শাস্ত্র-বিধির বন্ধনের কড়াকড়ি ছিল কঠোর, তখনো গৃহকর্মের গণ্ডি কেটে অনেক নারী নিজেদের প্রতাপ ও প্রতিভা বিস্তার করেছেন, সব দেশের ইতিহাসেই তার নজীর আছে। ইতিহাসে ধন্যা এই সব মহিয়সী নারীদের নিয়ে আমরাও গর্ব করে থাকি। পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে কি সামাজিক অবস্থায় তাঁরা স্বকীয় চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তা আলোচনা করলে বোঝা যাবে ওটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম।

নব্য ইয়োরোপের স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলনের তরঙ্গে প্রাচ্যও আন্দোলিত হয়েছিল। বিগত শতাব্দীতে বাঙ্গলা-দেশে সুরুতে রক্ষণশীল ও সংস্কারকদের বাদানুবাদের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করতে চাইনে। পরিবর্তন হয়েছে প্রচুর, সমাজের বিরুদ্ধতার জোর কমে গেছে। ধর্মের নামে যে সব অনুশাসন মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার বন্ধন থেকে সমাজের শিক্ষিত স্বচ্ছল স্তরে নারীরা কিছুটা মুক্তি পেলেও সমাজের সর্বস্তরে তার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়নি। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষ এমন কি শিক্ষিতবর্গের মনেও এই ধারণা রয়েছে যে কোন অবস্থাতেই মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়,

তাতে পারিবারিক জীবন হবে অশান্তিময়, সমাজে বাড়বে উশৃঙ্খলতা। যে বিধিনিষেধ পুরুষ মানে না, যে আচার তারা পালন করে না, মেয়েদের বেলায় তারই কড়াকড়ি। মেয়েদের আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি, শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছি কিন্তু তা আধুনিক সভ্যতার প্রতি ভদ্র দায়িত্ববোধের চক্ষুলজ্জায় কতক যন্ত্রযুগের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নিরুপায় হয়ে। মনটা রয়েছে মনু পরাশর জীমূতবাহনের যুগে।

রামমোহনের যুগে বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারবার অনুকূলে সমাজপতিরা এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বিধবারা ব্যাভিচারিণী হয়ে ধর্মহানি ঘটাবে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের বিরোধীতায় শাস্ত্রবাক্যের কুযুক্তির সঙ্গে বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, এ অধিকার দিলে নারীরা স্বামীদের বিষ দিয়ে হত্যা করে মনোমত পতি অন্বেষণ করবে। এর একশ' বছর পরে "হিন্দু কোড" বিলের বিরুদ্ধে দেবীরূপিণী ভারত-নারীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভারত সন্তানগণ তার-স্বরে চীৎকার করে বলছেন, মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার পেলে দেশশুদ্ধ নারী স্বৈরিণী হয়ে যাবে, আর বিবাহ বিচ্ছেদ আইনসঙ্গত হলে বউ নিয়ে ঘর করা চলবে না। মেয়েরা মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়ে অন্ধ সংস্কারের মধ্যে মুগ্ধা হয়ে থাকুক, এই নির্বোধ প্রত্যাশা যাদের, তাদের যুগধর্মের নিয়মে পরাভব মানতেই হবে।

পুরুষ রচিত বিধিব্যবস্থায় আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকারা অপমান বোধহীন ভয়ত্রস্ত নিরানন্দ জীবন যাপন করতেন। এক

জড়প্রথার অন্ধ আনুগত্যকে নিষ্ঠা মনে করে অবোধের যে সান্ত্বনা, তাই দিয়ে নিজেদের ভোলাতেন, এও দেখেছি। আর অর্ধশতাব্দী পরে দেখছি, আমাদের দেশের মেয়েরাও বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের আহ্বানে, দেশের বিবিধ মঙ্গল কর্মশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে কল্যাণলক্ষ্মীর মত দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘকাল মনে এই আশা পোষণ করেছি এরাই জ্ঞানের দীপ হাতে অবজ্ঞাত ভগ্নীদের মনের অন্ধকারকোণ আলোকিত করে তুলবেন।

একুশ

গ্রামের বাংলো থেকে রোজ তাসকেণ্ট সহরে দু'বার যাতায়াত করছি। কিণ্ডারগার্টেন, ম্যুজিয়ম, রাষ্ট্রের বৃহৎ গ্রন্থাগার, পাঠ-ভবন দেখে মনে হচ্ছে এ এশিয়ার অনগ্রসর দেশ নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি এর সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে। এই বৃহৎ সহরের চারদিকে বহু শিল্প কেন্দ্র রয়েছে। তুলোর দেশ বলে, কয়েকটি কাপড়ের কল আছে। একটি বৃহৎ কাপড়ের কল দেখলাম, নাম "টেক্সটাইল কম্বাইন"। বোম্বাই বা আমেদাবাদের আট দশটা কারখানা একত্র করলেও এর সমান হবে না। সাদা রঙ্গীন এবং নক্সাদার ছিট তৈরী হচ্ছে। সমস্ত মধ্য এশিয়ার কাপড়ের চাহিদা এখান থেকেই জোগান দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে এর পত্তন হয়, ১৯৪১ সালে তিনগুণ হয়েছে। আরো বাড়ানো হচ্ছে। দুই বর্গ মাইল কারখানা, ফুলের বাগান, সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়ে পথ। সূতো তৈরীর কলের টাকু তাঁত ছিট ছাপাবার রোটারী যন্ত্র সবই লেনিনগ্রাদ কারখানার তৈরী। এখানে উন্নত ধরনের ২৪টি তাঁতের তদারক করে একজন শ্রমিক। ৪৮ খানা তাঁত একা দেখেন এমন কয়েক জন স্টাকানোভাইট শ্রমিক দেখলাম। সমস্ত কারখানাটা ঘুরে দেখতে চার ঘণ্টা সময় লাগলো। সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি কারখানা সংলগ্ন স্কুল

হাসপাতাল প্রসূতিভবন বিশ্রামাগার সংস্কৃতিকেন্দ্র রয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য আনন্দ ও শিক্ষার ব্যবস্থা মস্কো স্তালিনগ্রাদের মতই।

বিকেলে একটা বৃহৎ সাধারণ উদ্যান দেখলাম। নাম গর্কী উদ্যান। এখানে সিনেমা নাচঘর পাঠাগার বক্তৃতার হল প্রভৃতি রয়েছে। ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার কত সাজ-সরঞ্জাম। এমন প্রমোদ উদ্যান তাসকেণ্টে অনেক আছে। একটি উদ্যানে একশত বিঘা জমির ওপর কৃত্রিম হ্রদ। তার চারদিকে স্নান ও সাঁতার কাটবার ব্যবস্থা, ডিঙ্গী নৌকায় ছেলেমেয়েরা বাইচ খেলছে। ছোট্ট একখানা স্টীমারও রয়েছে হ্রদের মধ্যে বেড়াবার। চারদিকে উপবন, খাবারের দোকান।

বাগান থেকে আমরা তাসকেণ্টের নবনির্মিত নাট্যশালায় এলাম। চারতলা বিশাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহে স্তরে স্তরে প্রায় দু'হাজার বসবার আসন। তিনতলায় সাতটি বড় বড় হলঘর। শ্বেত কৃষ্ণ নীল পীত নানা রংএর মর্মর পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্যে প্রাচীন শিল্পকলা অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটির গঠন-প্রণালী স্বতন্ত্র, খিবা বোখারা সমরখন্দ ফারগানা তাসকেণ্টের প্রাচীন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। বিশ বছর পূর্বে এদের নাটক অভিনয় নাট্যশালার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এখন বহু নর্তকী ও গায়িকার খ্যাতি সমগ্র সোবিয়েত রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিখ্যাত লোকনটী তামারা খানুমের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে বিখ্যাত ও স্তালিন পুরস্কারের অধিকারিণী, শ্রীমতী

গালিয়া ইসমাইলোভা ও মুকারম তুর্গুনবায়েভার নৃত্য দেখলাম। ভারতীয় নর্তকীদের সঙ্গে এদের ভঙ্গীর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। বাহু-বল্লরীর লীলায়িত সঞ্চালন আঙ্গুলের মুদ্রা গ্রীবাভঙ্গী তালে তালে লঘু পদক্ষেপ চঞ্চল চোখের চটুলতা বার বার দেশের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এই নৃত্য অসংস্কৃত ভাবে আবদ্ধ ছিল বাদশা সুলতানদের হারেমে বাঁদীদের মধ্যে, আজ শিক্ষিতা তরুণীরা তাকে জনগণের রসবোধ পরিতৃপ্ত করবার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন।

এই জাতীয় নাট্যশালায় ৬১৭ জন নর্তক নর্তকী অভিনেতা আছেন। আমরা যখন প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করলাম, তখন সমগ্র জনতা দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ভারতের নরনারী এই তাঁরা প্রথম দেখলেন।

বলশেভিক বিপ্লবের গোড়ার দিকে স্ত্রী স্বাধীনতা, 'পাঞ্জারা' বা বোরখা ও মোল্লাদের অনুশাসন বর্জন নিয়ে একটি তিন অঙ্কের গীতি-নাট্যের অভিনয় হ'ল। নাটকের বিষয় বস্তু হ'ল, এক আধুনিক যুবক তার স্ত্রীকে পর্দার বাইরে এনেছে, সংবাদ পেয়ে মেয়ের বাপ চটে লাল। মোল্লারা বিচার করে বিবাহ বিচ্ছেদের ফতোয়া দিলেন, বাবা মেয়েকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সুন্দরী যুবতী, মোল্লাদের আনাগোনা চলে, এক বুড়ো মোল্লার সঙ্গে আবার সাদীর ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। মায়ের আপত্তি, বাপ কান দেয় না। এদিকে প্রতিবেশিনী মেয়েরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে; অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে বিপ্লবের ঝড়ো হাওয়া। তারা ওর

স্বামীর খবর আনে, উৎসাহ দেয়। গোঁড়া মুসলমান বাপ একদিন মোল্লাদের প্ররোচনায় স্ত্রীকে শাসন করতে গিয়ে খুন করে বসলো। মেয়ে আর সহ্য করতে পারলো না, পাঞ্জারা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌লো, তার করুণ সঙ্গীতে প্রতিবেশিনী যুবতীরাও বোরখা-মেধ যজ্ঞে যোগ দিল। মিলনান্তক পরিসমাপ্তি। নাটকে গোঁড়া মোল্লাদের যে ভাবে বিদ্রুপ করা হ'ল, তা দেখে দর্শকরা করতালি দিয়ে হেসেই কুটিপাটি। আমাদের দেশে এমন নাটকের অভিনয় কল্পনাও করা যায় না, হলে রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যেতো।

সমাজতান্ত্রিক নবজাতীয়তাবাদের প্রভাবে ধর্মবিধির অন্ধ অনুবর্তনা রাশিয়ার কোথাও নেই। শুনেছি, বিপ্লবের গোড়ার দিকে ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত সমাজ-জীবনের আড়ষ্টতার বিরুদ্ধে তরুণেরা বিদ্রোহ করেছিল। এখন ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সকলে মেনে নিয়েছে। পাদ্রী পুরোহিত মোল্লারা এখনও গীর্জা মসজিদ আগলে বসে আছেন, বুড়োবুড়িরা মাঝে মাঝে সেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে যায়। কেউ ফিরেও চায় না। মনে আছে প্রাগের হাপস্‌বুর্গ বংশীয় সম্রাটদের আমলের সুবৃহৎ প্রাচীন গীর্জায় কয়েকজন খ্রীষ্টীয় সাধুকে দেখে এক চেক যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা তো গীর্জায় যাও না, তাহলে এঁরা কি করেন? যুবক হেসে উত্তর দিয়েছিল, "They pray for themselves."— ওঁরা নিজেদের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন।

বাইশ

৩রা আগস্ট শুক্রবার। তাসকেণ্ট সহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে কাগানোভিচ কৃষিক্ষেত্রে চলেছি। সহর ছাড়িয়ে, পাকা পীচ ঢালা রাস্তা, দুধারে গ্রাম, ক্ষেতে তুলা ভুট্টা আর গম চোখে পড়ল, আর দেখছি কাটা খালের মধ্যে জলস্রোত। দূরে অনতিউচ্চ শৈল-মালার কোলে বহুকাল পতিত জমি জল পেয়ে সজীব ও সবুজ হয়ে উঠছে। অবশ্য আমরা যে অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছি সেটা মরুভূমি নয়—তবু মধ্য এশিয়ার 'কারাকুম' বা কালো বালির মরু বিশাল স্থান জুড়ে আছে। এই মরু অচল নয়, সে তার শুষ্ক তৃষার্ত রসনা দিয়ে লেহন করে সরস মাটিকেও গ্রাস করে। প্রকৃতির এই খেয়াল চলেছে চিরকাল ধরে। মানুষের অবুদ্ধি গাছপালা অরণ্য নষ্ট করে মরুভূমিকে আমন্ত্রণ করেছে ঘরের দিকে। দিগ্বিজয়ীরাও প্রতি-পক্ষের দুর্গনগরী অবরোধ করবার জন্য জলের স্বাভাবিক ও হাতে তৈরী নহর ভেঙ্গে দিয়ে শত্রুকে কাবু করেছে, ফলে বহু নগর জনপদ বালুকা-সমাধি লাভ করেছে।

বিপ্লবের পর থেকেই সোবিয়েত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়লো এই বিশাল মরুর ওপর। এদের প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের মধ্যে মরুজয়ের সাধনা একটা মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। শুনলাম, কারাকুমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আমুদরিয়ার জলধারা নিয়ন্ত্রিত

করার কাজে হাত দেয়া হয়েছে। এই নদী প্রথমে উত্তর পশ্চিম খাতে চলতে চলতে বোখারার কাছে এসে খাড়া উত্তর মুখো হয়ে আরল সাগরে পড়েছে। পাঁচশ' বছর আগে পশ্চিমমুখো গিয়ে কাস্পিয়ান সাগরে পড়তো— তার শুকনো খাদ এখনও রয়েছে। নদীকে আবার যদি এই খাতে আনা যায় তাহলে কাস্পিয়ান সাগরের উন্নতি হবে ; আর বিস্তীর্ণ অঞ্চল শস্যশালিনী হয়ে উঠবে। এই সঙ্কল্পের ফল তুর্কোমান কেনাল— ৫০০-৬০০ মাইল লম্বা। শেষ হবে ১৯৫৬ সালে। আমি যেমন সহজে লিখছি ব্যাপারটা অত সোজা নয়। মাটির উঁচু নীচু, চারপাশের ঘাস লতা পাতা গাছ, বৃষ্টির জলের ঢলের স্বাভাবিক গতি প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে, বাঁধ দিয়ে জলকে উঁচু করে নূতন খাতে বইয়ে দেওয়া হবে, তার মাঝে মাঝে বসবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। গড়ে উঠবে নূতন জনপদ ও নগরী।

গাছের ঘনপ্রাচীর দিয়ে খালগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা পথে যেতে যেতে দেখলাম। খালের ধারে নূতন বসতিও চোখে পড়লো। অসমতল উষর মাটির ঢেউএর নামি কোলে কাপাসের ক্ষেত, গমের চাষ ফলের বাগানও আছে। এইবার আমাদের গাড়ী বড় সড়ক ছেড়ে মেঠো রাস্তায় পড়লো, যেমন রৌদ্রের তাপ তেমনি ধূলো, "ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর" হয়ে আমরা গ্রামে প্রবেশ করলাম। পথের ওপর অপেক্ষা করছিল তরুণ তরুণীরা শিঙে বাজিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করা হ'ল। তারপর সুরু হ'ল নৃত্যগীত। উৎসব ভূষণে সজ্জিতা তরুণীদের লোক সঙ্গীত ও

নৃত্যে ভারতীয় সাদৃশ্য প্রচুর। গ্রামের প্রধান মোড়ল এবং তাঁর সহকারীরা আমাদের নিয়ে সমিতির আপিসে বসালেন।

এই গ্রামে ৬৪০টি পরিবার, জনসংখ্যা তিন হাজার। জমির পরিমান ২৩৪০ হেক্তার, (১ হেক্তার=২·৪৭ একর)। প্রধান ফসল তুলো গম ভুট্টা ও ধান, এ ছাড়া আঙ্গুর পীয়ার আপেল পীচ প্রভৃতি ফলের বাগান আছে। ১৯২৯ সালে এর পত্তন হয়েছিল। ক্রমে খালের জল আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার দিয়ে চাষের প্রবর্তন হওয়ায় জমির ফলন তিনগুণ চারগুণ বেড়েছে। বাড়তি আয় থেকে শিশুপালনাগার কিণ্ডারগার্টেন স্কুল হাসপাতাল সংস্কৃতি ভবন নির্মিত হয়েছে।

জর্জিয়ার জুগদিদি সমবায় কৃষিক্ষেত্রের অধিবাসীদের স্বচ্ছলতার সঙ্গে এদের তুলনা হয় না, তবু মোটামুটি স্বচ্ছল। যারা মাটির দেয়াল ঘেরা গর্তে বাস করতো, তেল কেনবার পয়সার অভাবে যাদের ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলতো না, সন্ধ্যার আগেই খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হ'ত; তাদের আজ চওড়া রাস্তার তু'ধারে পাকা-ভিতের ওপর বাড়ী, বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান, উঠানে মাচার ওপর দ্রাক্ষাকুঞ্জ, থলো থলো আঙ্গুর ফলে আছে। আমরা হাতের নাগালে পাওয়া সরস আঙ্গুর সদ্য তুলে খেলাম। এই আঙ্গুর শুকিয়ে কিসমিস মনাক্কা হয়, বেশীর ভাগ দিয়ে সুমিষ্ট স্বল্প সুরাসার যুক্ত মদ তৈরী হয়, বড় বড় জালায় এই মদ রাখা হয়, সম্বৎসরের পানীয়। গ্রামের পথে ও বাড়ীতে বিজলী আলো, কোন কোন কৃষকের বাড়ীতে রেডিয়ো ও বিজলীর রান্না করবার উনান আছে।

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে প্রমোদভবন, সমবায় দোকান ও শস্য ভাণ্ডার। পাশে একটি নূতন সংস্কৃতিভবন তৈরী হচ্ছে। দোকানে রেশম পশম ও সূতি কাপড়, নানা রকমের মনোহারী ও প্রসাধন দ্রব্য, তৈজসপত্র রয়েছে। ফরাসী সুগন্ধীও আছে। কৃষকদের স্বচ্ছলতা ও ক্রয়ক্ষমতার আভাস পাওয়া গেল। আমাদের দেশের শতকরা নব্বুই জন কৃষক পরিবার যে সব জিনিষ কিনবার কল্পনাও করতে পারে না, এরা তা নিত্য ব্যবহার করে। এদের সমবায় গোলায় সঞ্চিত গমের রাশি দেখে অবাক হলাম। গোলার কর্তা বল্‌লেন, প্রত্যেক পরিবার গড়ে দু'টন শস্য বছরে পায়। অনেকেই পুরোটা নেয় না, তাই এত বাড়তি শস্য জমে গেছে। এই বাড়তি গম হিসেব করে আমরা সহরের শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে বেচে দেই। এই সমবায় কৃষিক্ষেত্রে গুটি-পোকার চাষের প্রচলন আছে, কুটির শিল্প হিসেবে উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র তৈরী হয়।

গ্রাম পরিক্রমার সময় লক্ষ্য করলাম, এরা সকলেই উজবেক নয়। তাজিক কাজাক তুর্কোমান এমন কি কয়েকঘর রুশ কৃষকও আছে। এদের গোষ্ঠীগত আচার প্রথা ও বসনভূষণের বৈশিষ্ট্য দেখলেই বোঝা যায়। গ্রামের পূবদিকে উদ্যান, তার একদিকে একটা ছোটখাটো বাড়ীতে পুস্তকাগার ও খেলাধূলার সরঞ্জাম। একটু দূরে তারই পাশে চেনার গাছের সার দেওয়া খালে কল্ কল্ করে জল চলেছে, তুলোর ক্ষেতে। এ খালের ধারে বিরাট ভোজ সভা বসলো। গ্রামের মাতব্বর নরনারীরা এসেছেন। প্রাচ্যের

আতিথেয়তার অজস্রতা, ঘরে তৈরী ছয় সাত রকম সুমিষ্ট সুরা। এমন সময় গ্রামের যুবক যুবতীরা এসে নৃত্যগীত জুড়ে দিলেন। ভোজ সমাপ্ত হ'লে কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ আমাদের উজবেক পোষাক উপহার দিলেন। আমাদের উজবেকী পোষাক পরিয়ে যুবতীরা নাচবার জন্য সাধাসাধি সুরু করলো। শেষ পর্যন্ত লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে এক প্রকার ভালুক নাচ নেচে অব্যাহতি পাই।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, আমরা তুলোর ক্ষেত, ট্রাক্টর ও কৃষি-যন্ত্রপাতির ঘর, অশ্বশালা ও গোশালা দেখে অধ্যক্ষের বাড়ীতে গেলাম। আবার ভোজসভা বস্‌লো। তিনি পুরনো দিনের এবং কৃষিক্ষেত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাস শোনালেন। এঁর বয়স ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেছে; দীর্ঘ সমুন্নত বলিষ্ঠ দেহ কর্মী পুরুষ। বল্‌তে লাগলেন, আমি আর দশজনের মতই ছিলাম ভূমিদাস। আমাদের এই গ্রামে ছিল আশী নব্বুই ঘর চাষী, দু'জন জোতদারের ছিল জমি, আমরা ছিলাম ভাগচাষী বা ভূমিদাস। প্রথম মহাযুদ্ধে জারের সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে গ্রাম ছাড়লাম, আকর্ষণেরই বা ছিল কি! বলশেভিক বিপ্লবের বার্তা নিয়ে আমরা পাঁচবন্ধু "পার্টিজান" সৈন্য হয়ে গ্রামে ফিরে এলাম। স্থান হ'ল না, মোল্লারা জোতদারের সঙ্গে যোগ দিয়ে লোক ক্ষেপাতে লাগ্‌লো, আমরা বনে জঙ্গলে থেকে সহৃদয় কিষাণদের সহায়তায় দল গড়তে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত প্রতি-বিপ্লবীদের হট্‌তে হ'ল। এরা যে কত দুঃখ পেয়েছে, না-বোঝার ফলে কত ভুল করেছে, সে সব স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, লজ্জা হ'ল

লোকসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত করবার জন্য আমরা কি করেছি, কেবল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখে যখন আমরা দিনগত পাপক্ষয় করেছি, এরা দু'খানা পোড়া রুটি খেয়ে সমবায় কৃষিক্ষেত্র গড়েছে, খাল কেটে এনেছে জল, উর্বর করেছে শুক্নো মাটি। তারপর এলো বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যায় সুপটু ওস্তাদেরা, এলো ট্রাকটর এলো শস্য ও তুলা ঝাড়াই কল। বহু বছরের অচলায়তন কৃষকজীবনের ধারাই আগাগোড়া বদলে গেল। আজ এরা রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যের দ্বারে প্রার্থী নয়, এরা কৃতী। সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পাকা করে পেয়েছে বীরের আসন। আমা-দের দেশে দেখি আরাম ঐশ্বর্য লাভের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা আর এখানে দেখলাম উৎপন্ন খাদ্য ও সম্পদ সকলের মধ্যে বণ্টনের সহৃদয় সহযোগিতা।

তেইশ

৪ঠা আগস্ট শনিবার। অশ্রান্ত ভ্রমণে ক্লান্ত দেহ মন, তবুও সমরখন্দের নাম শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। মধ্যযুগের রাজ্য সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যের কেন্দ্র সমরখন্দের খ্যাতি ও ঐশ্বর্য রূপকথার মত সমগ্র এশিয়া ও ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের সঙ্গে সমরখন্দের নানাদিক দিয়ে সম্বন্ধ ছিল। একদিন যেমন তক্ষশীলা এশিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র ছিল; মধ্যযুগে সমরখন্দ সেই স্থান অধিকার করেছিল। মুসলিম নরপতিরা চিরদিনই জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা ধর্মের গোঁড়ামি দেখাতেন না। বোগদাদ, ডামাস্কাসে শাসকেরা ইহুদী খৃষ্টান পণ্ডিতদেরও সমাদর করতেন। তিমুর তাঁর রাজধানীতে সব জাতির পণ্ডিত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখানে আরব ইরানী ইহুদী খৃষ্টান ও চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য দর্শনের অধ্যাপনা করতেন। উত্তর ভারত থেকে বহু ছাত্র সমরখন্দে অধ্যয়ন করতে যেতো। এ ছাড়া সমরখন্দ মধ্য এশিয়ার শিল্পবাণিজ্যের এক বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। গালিচা পশমী পোষাক, পশুচর্ম ও পশম, রেশম অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি ভারতে আমদানী হত। ইতিহাস ও মধ্যযুগীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ পাঠ করে সমরখন্দের বহু কীর্তিত রূপের যে মোহময় মূর্তি মনের

মধ্যে গড়ে তুলেছিলাম বাস্তবের সংঘাতে তা খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। বিগত বৈভবা মথুরাপুরীর মতই, এখানে কেবল স্মৃতি ও কিছু নিদর্শন রয়েছে। মধ্যযুগের ঐশ্বর্য ও বিলাস, দাক্ষিণ্য ও দস্যুবৃত্তি, প্রেম ও ঈর্ষা, হিংসা ও হত্যা এসব পেছনে ফেলে, স্বেচ্ছাচারী রাজমহিমাকে কবরে চিরপ্রসুপ্ত রেখে সমরখন্দ আধুনিক যুগে চলে এসেছে।

প্রতপ্ত মধ্যাহ্নে তাসকেণ্ট থেকে বিমানে চলেছি, দক্ষিণ পূব দিকে। দূরে বরফে ঢাকা তিয়েনসিন পর্বতমালা, নীচে অনতিউচ্চ শৈলশ্রেণীর কোলে সবুজক্ষেত্র, ছোট বড় কাটা খালের জলে উর্বর হয়ে উঠেছে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই বিমান ঘাঁটিতে আসা গেল। অসহ্য গরম, যেন মে মাসের দিল্লী। প্রতীক্ষমান মোটরে সহরের দিকে চলেছি, মাঝে মাঝে পুরাতন পরিত্যক্ত কবরখানা ভাঙ্গা মসজিদ পুরোনো দিনের স্মৃতির সাক্ষ্য, কোথাও বা উঁচু বালিয়াড়ি; বায়ু চালিত মরুবালুকা দিয়ে প্রকৃতি কতকাল ধরে এই সব নকল পাহাড় তৈরী করে চলেছেন, কে জানে। সহর দক্ষিণে রেখে এক জায়গায় এসে মোটর থামলো। সামনেই সরাইখানা, পাশে শীতল সুপেয় নির্মল জলধারায় বয়ে চলেছে গিরি নির্ঝর। গাছতলায় সাধারণ টেবিল চেয়ার। সরাইএর একটি বালক জল এনে দিল। তারপর কেটে দিল, সমরখন্দের বিখ্যাত খরমুজা। এই ফলটা তাসকেণ্টেও খেয়েছি। কিন্তু এযে খোদ সমরখন্দের। সম্রাট জাহাঙ্গীর উটের পিঠে করে চামড়ার মশকে বরফচাপা দিয়ে এই ফল কাশ্মীরে নিয়ে যেতেন। সম্রাটের রসনা

বিলাসের তারিফ করে টুক্‌রো টুক্‌রো খরমুজা মুখে দিলাম। বরফের মত শীতল, সুস্বাদু এবং মনোরম সুগন্ধ! সম্রাটভোগ্য ফলই বটে!

অনতিদূরে উলুক বেগের ১৬শ শতাব্দীর মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সোবিয়েত আমলে এর কিছুটা সংস্কার ও রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। দেখবার মত বিশেষ কিছু নেই। এর পর আমরা দিগ্বিজয়ী তিমুরের প্রাসাদদুর্গের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। একটা উঁচু স্থানের ওপর তৈরী, স্তরে স্তরে উঠে গেছে। সম্মুখে তোরণদ্বার, সকলের উপরে নীল রংএর টালিতে ছাওয়া বৃহৎ ডোম। ভিতরে বাসের মহল, তিমুরের স্ত্রী ও দাসীদের কবর, একটা মসজিদ, সেখানে প্রার্থনাবেদী এবং তিমুরের কোরান রয়েছে। সবটা মিলে বিশাল কিন্তু না আছে শ্রী না আছে কোন ছাঁদ। তারও অধিকাংশ ভগ্নস্তূপ। দিল্লী বা আগ্রার মুঘল স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের তুলনায়, চেহারার মিল থাকলেও সূক্ষ্ম কারুকার্যের রুচিবোধ নেই, কোন প্ল্যান তো নেই-ই। সম্রাটের খেয়ালে খাপছাড়া ভাবে তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে অগণিত দাসের অস্থি মজ্জা বসা অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাস দিয়ে। যিনি জয় ও পরকীর্তি ধ্বংসের নেশায় দেশদেশান্তরে উল্কাবেগে ঘুরে বেড়িয়েছেন, জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁবুতে, তাঁর প্রাসাদপুরীতে স্বর্ণ সিংহাসনে বসে রাজ-মহিমা নিশ্চিন্তে উপভোগ করার সময় কোথায়? ভিতরের মসজিদ বা প্রার্থনাঘরে কারুকার্য বিশেষ কিছুই নেই, মলিন গালিচা পাতা রয়েছে। এককোণে দু'জন ইমাম বসে আছেন বিষণ্ন মুখে। বোঝা গেল প্রার্থনার সময় আজানের ডাক শুনে

বিশ্বাসী ভক্তেরা আজ আর আসে না। আমি ইঙ্গিত করতে একজন উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম এই কোরান স্পর্শ করতে পারি। অনুমতি দিলেন। সাদা তুলোট কাগজে বড় বড় কালো হরপে লেখা, ভারতের বা ইরানের মধ্যযুগীয় কোরান গ্রন্থের মত নানা রংএর কারুকার্য নেই। দেখা শেষ করে বললাম, আমি হিন্দুস্থান থেকে এসেছি। শুনে খুশীতে তাঁর জরাকুঞ্চিত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। বাঁ হাতে আমার হাত ধরে, ডান হাত তুলে ঈশ্বরের নামে আমায় আশীর্ব্বাদ করলেন। মনে পড়ে গেল, দিল্লীর জুম্মা মসজিদের বৃদ্ধ ইমামের মুখখানি, তাঁরও স্তিমিত দৃষ্টিতে দেখেছিলাম, অতীত দিনের স্বপ্নের ছায়া। ওঁর হাতে কয়েক রুবল গুঁজে দিলাম, বিহ্বল হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন।

সহরের কেন্দ্রস্থলে তিমুরের বিশাল মসজিদ ভূমিকম্পে তিনচতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। ফতেপুর সিক্রির মত বৃহৎ খিলান দেওয়া তোরণটি কোনমতে খাড়া আছে। পশ্চিম দিকের অংশটা নানা ভঙ্গীতে ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোন মুহূর্ত্তে ধসে পড়তে পারে, কাছে যাওয়া বারণ। এর সংস্কার বা পুনর্গঠন অসম্ভব।

অনতিদূরে তিমুরের পৌত্রের তৈরী মসজিদ ও মক্তব। এর মিনার চারটি খাড়া আছে। উত্তর ও দক্ষিণের তোরণদ্বার ও মুশাফিরখানা মেরামত হচ্ছে। পশ্চিম দিকের প্রাচীন বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস অনেকটা অক্ষত। সোবিয়েত গভর্নমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে এর সংস্কার করছেন।

তিমুরের সমাধি সৌধ। খুব বড় নয়; ভেঙ্গে শ্রীহীন হয়ে গিয়েছিল, গম্বুজের নীল টালি বসান শেষ হয়েছে। আগাগোড়া সংস্কার চলেছে। ঐতিহাসিক স্মৃতিরক্ষার কাজে সোবিয়েত গভর্নমেণ্টের কার্পণ্য নেই। দেখলেই বোঝা যায়, ইরানী স্থাপত্যরীতিতে সমাধি সৌধ তৈরী হয়েছিল। নীচের তলায়, তিমুরবংশের তিনপুরুষের বংশধর ও তাঁদের পত্নীদের কবর। দোতালায় কেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণ মর্মরে তৈরী হাত তিনেক উঁচু চতুষ্কোণ তিমুরের সমাধি, তার দু'পাশে উলুক বেগ এবং তাঁর আর এক প্রিয়পুত্রের সমাধি। শিয়রে তিমুরের ধর্মগুরু পীরের সমাধি। লক্ষ লক্ষ ছিন্ন নরমুণ্ডের ওপর যাঁর জয়কেতন উড়তো, বিদ্রোহীর তরবারীর আঘাতে তার মস্তকও মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তিমুরের সমাধি থেকে কঙ্কাল তুলে দেখা গেছে দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন। কঙ্কাল পুনরায় সমহিত করা হয়েছে। কঙ্কাল দেখে জীবদেহ গঠনে কৌশলী সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা তিমুরের এক পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরী করেছেন। ম্যুজিয়মে সেই মূর্তিটা রয়েছে। তিনি খঞ্জ ছিলেন বটে, কিন্তু লম্বায় ছ'ফুটের ওপর বলিষ্ঠ দেহ ছিল।

সমরখন্দ বিস্তীর্ণ সহর। অধিবাসীর সংখ্যা দু'লাখের ওপর। মধ্যযুগ ও বিংশশতাব্দী হাত ধরাধরি করে আছে। রাস্তায় অনাবৃত মুখ আধুনিকাদের নিঃসঙ্কোচ চলাফেরার মধ্যে কয়েকজন আপাদমস্তক বোরখা বা পাঞ্জারায় ঢাকা নারীও দেখলাম। বড় বড় রাস্তায় ট্রাম বাস চলছে, দু'পাশে আধুনিক সুউচ্চ

হর্ম্যমালা। এখানকার গালিচা পশমী ও রেশমী বস্ত্র, রৌপ্য তাম্র এবং ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র বিখ্যাত। এই সব শিল্পের কারখানা দেখবার সুযোগ ও সময় পেলাম না, ম্যুজিয়মে সুরক্ষিত নমুনা দেখেই কৌতূহল নিবৃত্তি করতে হ'ল।

স্থানীয় শিক্ষাবিভাগের একজন বড়কর্তা এক ভোজ সভায় আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রাচ্যের আতিথেয়তার ঔদার্য, ভোজ্যবস্তুর বিপুল সমাবেশ। তিনি ভারত ও সমরখন্দের অতীত সম্পর্ক আলোচনা করে বল্‌লেন, পররাজ্য জয় লুণ্ঠন ও দাস ব্যবসায়ের দিন শেষ হয়েছে, এই বিজ্ঞানের যুগে নানাদেশের মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে। এমন দিন শীগ্‌গীরই আসবে, যখন আমাদের দেশ ও ভারতের মধ্যে বিমানপথ উন্মুক্ত হবে। সেদিন আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ হব।

সন্ধ্যায় তাসকেণ্টে ফিরে এলাম। স্থানীয় লেখক সঙ্ঘের বিদায় সম্বর্ধনায় উভয়দেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হ'ল। উজবেক লোকসাহিত্য প্রাচীন গাঁথা গল্পে সমৃদ্ধ, সেগুলো এঁরা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। আধুনিক সাহিত্যও পেছিয়ে নেই। "সংস্কৃতি" শব্দটা আমাদের দেশে আজকাল ছোটবড় বহু রসনা থেকে অহরহ টঙ্কার দিয়ে ওঠে। বাঙ্গলাদেশের তরুণেরা ক্লাব সঙ্ঘ প্রভৃতিতে সংস্কৃতি সম্মেলন করে থাকেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞরা 'ভারতীয় সংস্কৃতি' বলে যার গৌরব ঘোষণা করেন, তার সমগ্র রূপটা যে কি সে সম্বন্ধে তাঁদের

নিজেদের মনেও কোন স্পষ্ট ধারণা আছে কিনা সন্দেহ! যে দেশে শতকরা আশীজনের জীবন যাত্রার মানদণ্ড এত নীচু যে সহজাত প্রবৃত্তির আবেগে চালিত জীবনযাত্রা নির্বাহ ছাড়া আর কিছু তারা ভাবতেই পারে না, সেখানে সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি লোকসাধারণের অনুরাগসম্ভবই নয়। উজবেকদেরও ছিল সেই দশা। কৃষি, পশুপালন ও কুটিরশিল্পের একটা সনাতন ধারা অনুসরণ করে কায়ক্লেশে টিকে থাকার মধ্যে সংস্কৃতির বিলাসিতা চলে না। আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এসেছে কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক প্রথায় জলসেচ ও কৃষি ব্যবস্থা। মানুষ স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছে বলেই সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্যকলা নূতন প্রাণের প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে। এখানকার সংস্কৃতির সম্পদ শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নয়। যা সর্বমানবের সম্পদ, তা লোকসাধারণ জল হাওয়ার মতই সহজে উপভোগ করছে।

চব্বিশ

৫ই আগস্ট রবিবার মধ্যাহ্নে মস্কৌএ ফিরে এলাম, আমাদের সোবিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ শেষ হ'ল। ইয়োরোপ ও এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত এই বিশাল দেশের একটা সামান্য অংশ মাত্র দেখবার সুবিধা পেয়েছি। আধুনিক যুগের আকাশচারী দ্রুত ধাবমান বিমান না থাকলে, ছ' মাসে যা দেখলাম তা এক বছরেও সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। এখানে যে একটা নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটছে যে কোন স্থুলদৃষ্টি পর্যটকও তা স্বীকার করবেন। 'হোটেল ন্যাশনালে' ছ'চার জন ইংরাজ ও আমেরিকান ভ্রমণকারীর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, এখানকার শ্রমিক ও মস্তিষ্কজীবীরা সুখস্বচ্ছন্দে আছে এটা তাঁরা অস্বীকার করেন না, তবে পশ্চিমা সভ্যতার রীতিনীতি একদম ওলট পালট করে দিয়ে যে সমাজ-তান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে উঠছে, তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দিহান।

সোবিয়েতের সমালোচকেরা বলেন, মার্কসীয় অর্থনীতির গোঁড়ামির জবরদস্তী দিয়ে লোকসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার যে প্রয়াস তা টিক্‌বে না। এ অপবাদটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সোবিয়েত বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে স্বাধীন

আলোচনার পথ জোর করে কোথাও অবরুদ্ধ করা হয়নি। যেখানে শিক্ষার ব্যাপ্তি ও বিস্তার অবাধ সেখানে চিন্তার বহুমুখী গতিকে ঠেকান যায় না। তা এরা করেনি, করছে না বলেই জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ এখানে সহজ হয়ে উঠেছে।

একজন বলে উঠলেন, সমস্ত ধনতন্ত্রী জগতের বিরুদ্ধতায় বেষ্টিত হয়ে যে বৈপ্লবিক আবেগে এরা সমাজতন্ত্র থেকে কমিউ-নিজমের পথে যাত্রা করেছে তা যখন সিদ্ধিলাভ করবে তখন এই বৈপ্লবিক আবেগ শিথিল হয়ে যাবে। তারপর আজকের এই নিবিড় ঐক্য যাবে ভেঙ্গে আবার শ্রেণীভেদ সমাজে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠবে।

পশ্চিমা মানবহিতৈষীরা এই ভরসা নিয়েই আছেন। ভাবী-কালের এই কাল্পনিক চেহারা নিয়ে তর্ক করা চলে না। ধর্ম আর তার অনুশাসন দিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখতে তিন হাজার বছর কম বীভৎস চেষ্টা হয় নি। কিন্তু যুক্তিপন্থী বিজ্ঞান সে মোহ ভেঙ্গে দিয়ে মানুষের মুক্তিকে সম্ভব করেছে। এই বিজ্ঞানের সাধনাকেই সোবিয়েত গ্রহণ করেছে, ধর্মমূঢ়তার স্থানে আর এক যুক্তিহীন মূঢ়তাকে তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে, মনে এমনতর সন্দেহ জাগবার কোন কিছু আমার চোখে পড়েনি। ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা সভ্যতার আওতায় আমাদের চিন্তাধারা ও লোকব্যবহার যে ছাঁচে ঢালাই হয়ে আছে তাই দিয়ে যখন অপরকে বিচার করি, তখন দৃষ্টি ঘোলাটে হবার সম্ভাবনা পদে পদে। সমবায় প্রথায় খাদ্য পণ্য সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে

এরা একত্র মিলেছে, অথচ সোবিয়েত ভূমিতে কত আলাদা জাত গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নিজেদের আচার নিয়ম রুচি ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে কোথাও বাধা পাচ্ছে না এই তো দেখলাম জর্জিয়ায় উজবেকিস্থানে।

কি ছিল এদের আর কি হয়েছে, ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। ১৯১৭-২২এ রুশদেশের যে সব খবর আমাদের দেশের বিদেশী ও স্বদেশী কাগজে রয়েটারের রীগা সংবাদদাতা পরিবেশন করতেন; তা পড়ে ভাবতাম রাশিয়া রসাতলে তলিয়ে গেল বলশেভিকদের পাল্লায় পড়ে। শহরের চলাচলের রাস্তায় গজিয়েছে ঘাস, তার দু'ধারে পরিত্যক্ত পাকা বাড়ী খাঁ খাঁ করছে। গ্রামের খেতখামার অকর্ষিত; আগাছায় উঠেছে ভরে। কারখানার কল বিকল হয়ে মরচে-ধরা, রেল যান বাহন অচল, ঘরে বাইরে অশান্তি! এই পর্বত প্রমাণ ধ্বংসস্তূপের ওপর নূতন রাশিয়া গড়া সম্ভবপর হয়েছে বিশ্ব ধনতন্ত্রের প্রতিকূলতা ও কুৎসা প্রচারের অপবিত্র আয়োজনকে ব্যর্থ করে।

নবীন রাশিয়া সবে মাত্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ইয়োরোপের অঙ্গনে প্রকাশ পেল নাৎসী ফাসিস্ত বর্বরতা। পরের অধিকার লঙ্ঘনের বলদৃপ্ত নিষ্ঠুরতা নির্লজ্জ মূর্তিতে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে অগ্নিগিরির গলিত আগ্নেয় স্রাবের মত নাৎসী বাহিনী দিগন্ত রাঙ্গিয়ে সোবিয়েত ভূমির ওপর গড়িয়ে চললো প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের কেতন উড়িয়ে। লেনিন-স্তালিনের সৃষ্টি বুঝি রসাতলে তলিয়ে যায়। কিন্তু আর এক

দুর্বার শক্তি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সঞ্চিত হয়েছিল যা ধনতন্ত্রী জগতের সেয়ানা পলিটিসিয়ানদের কল্পনায়ও ছিল না। অঘটন ঘটলো। সোবিয়েত জনগণ দাঁড়ালো লাল-পল্টনের পশ্চাতে, শত্রুর গতি অবরুদ্ধ হ'ল। চারবছর জীবনমরণ তুচ্ছকারী যুদ্ধের মধ্যেও সোবিয়েত রাশিয়া গঠনকাজ ভোলেনি। জয়লাভ করার পরমুহূর্তেই সে নিরহঙ্কৃত কর্তব্যের সাধনাকে অনুদ্বিগ্ন চিত্তে গ্রহণ করেছে।

এই সোবিয়েত রাশিয়ার জনজীবন এবং সৃষ্টিকে দু'চোখ ভরে দেখলাম। যখন আমেরিকা তার সমস্ত ঐশ্বর্য রণদেবতার অর্ঘ্য রচনায় উৎসর্গ করছে; যখন আমেরিকার নেতৃত্বে জোটবদ্ধ সামরিকশক্তি অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগারর তীরে তীরে পুরনো ছুরি নূতন করে শানাচ্ছে, তখন এখানে এসে দেখি, এদের উদ্বেগ নেই, শঙ্কা নেই। আমেরিকা তাল ঠুকে বলছে, 'অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া'। সোবিয়েত স্মিতমুখে বলছে, আমি শান্তিনীতিতে বিশ্বাসী, মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর আমার ভরসা আছে। বিশ্ব-শান্তির আগ্রহ ও অকৃত্রিম আবেগ দেখে আনন্দিত হয়েছি। মনুষ্যত্বের ওপর অবিচল বিশ্বাস নিয়ে এই শান্তি আন্দোলনের নেতা স্তালিন বিশ্ব-মানবকে আর একটা ভয়াবহ যুদ্ধের দুর্গতি থেকে রক্ষা করবার সাধনায় সমাসীন।

এই মহান লোকনায়কের দর্শনলাভের সুযোগ আমার হয়নি, অত কাছে গিয়েও, এই অসাফল্যের দুঃখটা মনে রয়ে গেছে। আমরা মস্কৌ যাওয়ার পরই এক রবিবার সোবিয়েত বিমান-

বাহিনীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেখানে স্তালিন ও অন্যান্য নেতাদের দর্শন পাওয়া যাবে ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলাম কিন্তু আবহাওয়ার দরুণ উৎসব স্থগিত রাখা হ'ল। পরে যখন অনুষ্ঠান হ'ল, তখন আমরা লেনিনগ্রাদে।

৫ই আগস্ট রাত্রে ঘটা করে বিদায় ভোজ হ'ল। মস্কৌর সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা ভারত ও সোবিয়েতের স্থায়ী বন্ধুত্ব কামনা করে বক্তৃতা করলেন। আমরাও বললাম, আপনাদের বৃহৎ দেশের নয়া সমাজব্যবস্থা এবং গঠন ও পুনর্গঠনের কথা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে থাকে। আমরা যা দেখে গেলাম, তা যথাযথ ভাবে দেশের লোককে জানাবো। বিশেষভাবে শিশু ও কিশোরদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের যে অকৃপণ আয়োজন আপনারা করেছেন, তা থেকে আমাদের গ্রহণ করবার অনেক কিছুই আছে। বিশ্ব-শান্তি রক্ষার আগ্রহ নিয়ে আমরা আপনাদের সতীর্থ ও সহযাত্রী।

রাত্রি দুটোয় হোটেলে ফিরে এলাম। জানালা দিয়ে দেখি, ক্রেমলীন অচলপ্রতিষ্ঠ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে; তার উত্তর-তোরণের সমুন্নত ললাটে রক্ততারকার সমুজ্জল জয়টিকা।
